মুজাহিদের সংলাপ ও জিহাদ শিক্ষা

মূল ঃ মাওলানা মাসউদ আযহার

মুজাহিদের সংলাপ
ও
জিহাদ শিক্ষা

রচনা

কমান্ডার মাওলানা মাসউদ আযহার

মুহাঃ ইয়াকুব আলী তৌহীদ

প্রকাশনা

রহিমিয়া লাইব্রেরী

ঢাকা

মুজাহিদের সংলাপ
ও জিহাদ শিক্ষা
মূল- মাসউদ আযহার

প্রকাশক-
মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ
কুন্দার পাড়া, শিবপুর
নরসিংদী।

প্রথম প্রকাশ-
জুলাই, ১৯৯৮ইং

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ ঃ ১। এন্টি ইয়ারক্রাফ্‌ট গান। ৪ব্রেল।
এবং ২। ট্যাংক।

প্রাপ্তিস্থান-
চকবাজার, বাংলাবাজার, বায়তুল মুকাররম ও
দেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহ।

প্রকাশকের কথা

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নিকট লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর হলেও প্রকাশ পেল 'মুজাহিদের সংলাপ ও জিহাদ শিক্ষা' বইখানি। বক্ষমান বইটিতে জিহাদ সম্পর্কিত অসংখ্য ইশকালের উপর কলম চালিয়ে তাকে কুরআন-হাদীস ও প্রামাণ্য যুক্তির দ্বারা খন্ডাতে সক্ষম হয়েছেন। বর্ণময় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নবীন লেখক।

প্রকাশক হিসেবে নয়, একজন পাঠক হিসেবেই বলতে হচ্ছে লেখক কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং যুক্তিগুলিকে এমন এক অভিনব ভঙ্গিতে পেশ করেছেন যে, তা জিহাদ বিদ্বেষী বা জিহাদ সম্পর্কে অপব্যাখ্যাকারীদের বহুদিনের লালিত ভ্রমচিন্তাকে ভিম বেগে নাড়া দিয়ে উঠবে এবং সচেতন হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলবে।

যারা জানতে চান কুরআনের সেই আয়াতগুলো- যা শ্রবণে সাহাবাদের রক্তে শিহরণ জাগত, তার প্রয়োজনীয়তা কি শেষ হয়ে গেছে না আছে? তাদের বইখানি পড়ে দেখা অবশ্য জরুরী। বইখানির ভাষাশৈলীতে এক নতুনত্বের ভাব ফুটে উঠেছে। যা বইখানিকে করে তুলেছে সুখপাঠ্য।

আশাকরি বইখানি পড়ে পাঠক মহল এমন কিছু বিষয় অবগত হতে পারবেন যা সময়ের দাবী। পরিশেষে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যারা আমাকে এতে সহযোগীতা করেছেন। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন॥

ইতি
প্রকাশক

তারিখ
২৩শে জুন ১৯৯৮ইং

উৎসর্গ

ঐ সকল নবীন মুজাহিদদের তরে। যাঁরা সকল বাধাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে দৃঢ় সংকল্পে পথ চলছে। আর আরোপিত তামাম ইশকালকে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনে আসান করে নিয়েছে।

ই. আলী তৌহীদ

দরবারে নববী হতে

এক

মহান সুসংবাদ

আমার উম্মতের মধ্য হতে দু'টি গ্রুপের জন্য আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তি লিখে দিয়েছেন। এক- ঐ গ্রুপ যাঁরা হিন্দুস্থানের যমীনে জিহাদী অভিযান চালাবে। দুই- আর যাঁরা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. এর সঙ্গী হবে (তাঁর আকাশ হতে অবতরণের পর)।

-নাসায়ী শরীফ (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৩)

দু'টি কথা

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা! প্রথমে আপনাদের মঙ্গল কামনা করছি। অতপর বিশেষ অবগতির জন্য বলছি। এই পুস্তিকাতে প্রথমে আলোচিত হয়েছে, জিহাদের সংজ্ঞা সংক্রান্ত ইশকাল বা অহেতুক প্রশ্নাবলী ও তার সঠিক সমাধান। পরবর্তীতে জিহাদের বিধান, প্রকারভেদ, শর্তাবলী, আরাকান পর্ব ও আগে তাবলীগ পরে জিহাদ বিষয়গুলোতে কলম ধরা হয়েছে।

বন্ধুরা! আমার কলম হয়তো কারো হৃদয়ে আঁচড় বসাতে পারে। কেননা, এই কলম এমন কিছু কথার উপর চরম ভাবে আঘাত হেনেছে যা "মশহুরুন আ'লাল আসনাহ্" অর্থাৎ কেবল লোকমুখেই প্রসিদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বাস্তবে তার 'ব' ও নেই। এ অবাস্তব প্রসিদ্ধ কথা যে হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। সে হৃদয়ে এ বইয়ের ভাষাগুলো শেলের আঘাত হাঁনবে এটাই স্বাভাবিক। তবে অনুগ্রহ পূর্বক সে আঘাতে চিৎকার করবেন না। নিজে নিজে বেফাঁস মন্তব্য না করে বন্ধু মনে করে আপত্তিকর বিষয়টাকে সরাসরি আমাকে জানালে খুবই আনন্দ পাব। আর যদি সত্যিই তা আপত্তিককর হয় তবে ক্ষমা প্রার্থণাপূর্বক তা শুধরিয়ে নিতে বাধ্য থাকব। আর হাঁ, আপনার মনে এই পুস্তক বহির্ভূত কোন নতুন ইশকালের উদ্রেক হলে যে কোন উপায়ে জানালে কৃতজ্ঞ হব কিন্তু!

বিনীত
লেখক

উপক্রমণিকা

দুনিয়ার সব কিছু যখন আধুনিকতার পরশ পেয়ে উল্কার গতিতে ছুটছে। সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে গোটা পৃথিবী। যখন হোয়াইট হাউজের সংবাদ নিয়ে কোন কাসেদকে আর মাসকে মাস ঘোড়া হাঁকিয়ে ইউরোপের মাটিতে পৌঁছতে হয় না। সুইচ টিপতেই কারবার খতম হয়ে যায়।

এহেন যুগে অনেক অতি ঈমানের দাবীদার এমন রয়েছেন, যাদের কাছে তরবারীর স্থলে ট্যাংক-কামান ব্যবহার নাকি আপত্তিকর। সেতো ভাল। অনেকে তো এমন ও রয়েছেন যাদের 'সাইফুল্লাহ' উপাধী পেতে এখন আর তরবারী হাঁকাতে হয় না। বরং কোন স্টেজে বা মসজিদের মিম্বরে বসে দু'চারটি গলাফাঁটা বুলি ছুড়তে পারলেই 'খোদার অসি' উপাধীটা জুটে যায়। গুলির স্থলে বুলিরই এখন জয়জয়াকার। তবে আসল ময়দান জ্বলে ছারখার।

জিহাদ সম্পর্কেও অনেকের মাথায় চেপে আছে ইশকালের ইয়া বড় বোঝা। যার ভারে ন্যুজ হয়ে এক কালের সিংহের জাতি আজ গাধার পালের ন্যায় সেতাংগ ভালুকের সামনে মাথা নুয়ে চলছে। ফলে তারা যেমন খুশী তেমন করে তাড়িয়ে মাড়িয়ে চালিয়ে বেড়াচ্ছে। বসনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, আরাকান ইত্যাদি যার বাস্তব চিত্র।

আর হাঁ, ইশকালের সেই ইয়া বড় বোঝাটা মাথা হতে নামানোই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার লক্ষ্য। জানিনা, কতটুকু স্বার্থক হব। তবে হলফ করে বলতে পারি, আমার রচিত নিবন্ধ 'মুজাহিদের সংলাপে' না হতে পারলেও এ বইয়ের দ্বিতীয় অংশ 'জিহাদ শিক্ষা' নামক অনুবাদটিতে ইনশাআল্লাহ স্বার্থক হব। কেননা, 'লেখকের গুণে লেখার মান' আর ঐ লেখাটি লিখেছেন এমন এক ব্যক্তিত্ব; যিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মজলুমানের মুক্তির তরে নিজেই মজলুম হয়ে আজ ভারতের জিন্দানখানায় বন্দীত্বের ঘানি টানছেন। যাঁর যাদুমাখা জ্বালাময়ী তাকরীর কাশ্মিরের

মাটিকে আন্দোলিত করে তুলেছে। সেই বাগযাদুকর জীবন্ত কিংবদন্তী পুরুষ হলেন কমান্ডার মাওলানা মাসউদ আযহার। নবীনদের তরে রচিত তাঁরই 'তা'লীমুল জিহাদ' উর্দূ বইয়ের সরল বঙ্গানুবাদ হলো 'জিহাদ শিক্ষা'।

পড়ালেখার ভিড়কে সামলে নিয়ে অতি স্বল্প সময়ে লেখা ও অনুবাদের কাজে ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। আশাকরি পাঠক মহল তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাকে শুধরিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতার দ্বার পাশে আবদ্ধ করবেন।

পরিশেষে আমার দয়াময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থণা করছি, প্রভূ হে! তুমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল কর।

-আমীন॥

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ॥

মুজাহিদের সংলাপ

সংজ্ঞা সংক্রান্তঃ

আঁধারে ঘেরা কন্টকাকীর্ণ পথ। কোথাও সরু কোথাও মরু। কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। নিকশ কালিমামাখা আকাশ। ইশকালের বোঝা মাথায় চেপে মুশকিল মিঁয়া ধাই ধাই পথ চলছে। কোন দিকে যাবে পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। হোঁচট খাচ্ছে বারংবার। যেন গন্তব্যহীন পথিক। হুমড়ি খেয়েয়ে পড়ে গেল হঠাৎ। একেবারে চিৎপটাং। বেদনার দাবানলে দহন হয়ে হৃদয়ের গহীন থেকে বেরুল এক ক্ষীণ আর্তনাদ- 'উহু'। ইথার-পাথার সেই আর্তনাদের ঝংকার তুললো- 'আহ!'। মাথার ইশকাল জমীনে ছড়িয়ে পড়েছে। গুছিয়ে নিতে উঠে বসলো। অমনি দেখতে পেল নিকশ কালো আকাশ হতে ধ্রুব-জ্যোতি তারকার ন্যায় তার সামনে নাযিল হলো বাল্যকালের তর্কবন্ধু মুজাহিদুল ইসলাম।শুধালেন;

ঃ এই অসময়ে কাঁটাময় আঁধার পথে লাঠিসোটা ছাড়া কোথায় যাচ্ছিলে? জবাবে মুশকিল সাব বললো, আরে ভাই! কোন পথে আর যাই। যে দিকে তাকাই, শুধু ইশকাল আর ইশকাল। যেন চোখে শর্ষে ফুল। দিক ভ্রম হয়ে পরিশেষে পড়েই গেলাম। মাথা হতে ইশকালের বোঝা পড়ে তা ছড়িয়ে গেল। ইশকাল বড় মায়ার ধন, মায়া বিসর্জন না দিতে পেরে পুনরায় ইশকাল গুলি গুছিয়ে নিতে প্রস্তুত হলাম। অমনি দেখি সামনে এমন বন্ধু যে সকল ইশকাল আসান করে বীর দর্পে পথ চলছে। আচ্ছা! ইসলামের মুজাহিদ, মুজাহিদুল ইসলাম ভাই! আপনি কিভাবে এতো সহজভাবে পথ

চলেন। আমাকে আপনার সঙ্গী করে নিবেন কি?

ঃ না, আপাতত কোন মুশকিলদের সঙ্গে নেয়া যাচ্ছেনা। তবে তোমাকে নিবো। এখন নয়, তোমার মাথায় সকল ইশকাল ধুয়ে মুছে সাফ করে মুশকিলকে আসান করে তার পর। কেননা, মুশকিলরা মাঝ দরিয়ায় হাল ছেড়ে জাতিকে বিপাকে ফেলে দেয়।

ঃ আচ্ছা! সে কোন পথের যাত্রী আপনি? যে আপনার সাথে যাত্রা করতে হলে এমন হতে হবে।

ঃ তা কি তোমাকে এখনি বলতে হবে?

ঃ না, সে দাবী জানাবো না। তবে বললে যদি এ দিকভ্রম পথিক কোন পথ পেয়ে যেত। তাহলে.....

ঃ তাহলে কতইনা ভাল হতো, তাই তো? আচ্ছা তা বলার আগে তোমার মাথার ইশকাল পাড়তে থাকো আর আমি তা ঝাড়তে থাকি।

ঃ আরে ভাই সব ইশকালের উপর এখন এটাই ইশকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আপনি কোন পথে যাচ্ছেন। এবং আমি আপনার সাথে কোন পথের পথিক হতে যাচ্ছি।

ঃ ও- তাই! তুমি আমার সাথে বাণিজ্যেতে যাচ্ছ, ব্যবসা করতে। মানে বিজনেস ম্যান হতে।

ঃ এ আবার কেমন কথা! মুসলিম মা-বোনেরা মরছে নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে; আর আমরা সাজাবো সিন্দাবাদের বাণিজ্যতরী! ময়ূরপঙ্খী নাও!! আসলে এজন্যই আপনার সাথে আমার মত মিলতে চায় না।

মুজাহিদ সাব এবার রেগেই বললেন-

ঃআরে মিলতে চাবে কি করে শুনি? মুশকিল সাবরা তো শুধু কথা আর ইশকালে বিশ্বাসী। আর মুজাহিদ সাবরা তো কাজে বিশ্বাসী। সব

বাণিজ্যই যে হিন্দবাদ আর সিন্দবাদের বাণিজ্য নয় সে জ্ঞানও নেই। কোন ব্যবসা করতে যাচ্ছি তা ও বুঝতে সক্ষম নয় আবার চট করে মাথা গরম করায় বেশ পটু।

ঃ মাফ করবেন! আপনি এতো চটে যাবেন বুঝতে পারিনি। আচ্ছা একটু খুলেই বলুন না। এ বাণিজ্য কোন বাণিজ্য?

ঃ আমাকেও ক্ষমা করলে খুশী হব। মনের অজান্তেই রেগে গেলামতো তাই। এবার শুনো, আমরা যে বাণিজ্যের সন্ধানী, তার সন্ধান আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। কেন তুমি কুরান খুলে দেখনি, সেখানে আল্লাহ্ বড় আবেগ আর আশার ছলে তার প্রিয় বান্দাদের ডেকে বলেছেন, "হে আমার প্রিয় বান্দারা! আমি কি তোমাদের এমন একটি বাণিজ্যের সংবাদ দিব না? যা তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দানিবে।" (সুরা সফ-১০)

ঃ ও আচ্ছা! তাই বল!! এতো বহুবার শুনেছি। আমাদের ইমাম সাব এর ব্যাখ্যার দিয়েছেন। বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। একটাকায় সত্তর টাকা মিলবে। ইহা আল্লাহর সাথে ব্যবসা। এর চেয়ে লাভের ব্যবসা নেই।

ঃ শুনেন মুশকিল সাব! খাঁটি সোনা চিনতে হলে ভাল সোনারু বা স্বর্ণকারের কাছে যেতে হবে। পানের দোকানদার তো চিনিয়ে দিতে পারবে না। এ ব্যবসার সঠিক সংজ্ঞা জানতে হলেও ভাল কোন ব্যবসায়ীর কাছে যেতে হবে। এমন ব্যবসায়ী যিনি একেবারে বাণিজ্যনীতির মূলগ্রন্থ কুরআন খুলে এর ব্যাখ্যা দেখিয়ে দেবেন। কোন পীর, মুরব্বী আর শায়খের মুখের কথা দিয়ে নয়। কেননা পীরেরা বলবে আল্লাহর সাথে ব্যবসা মানে এক টাকা হাদিয়া দিয়ে সত্তর টাকা কামাই করা। মুরব্বীরা বলবে আল্লাহর রাস্তায় একটাকা নিজে খেয়ে পরকালে সত্তর টাকা পাওয়া, আর মাদ্রাসার শায়খেরা বলবেন, মাদ্রাসায় একটাকা দান করে কিয়ামতের দিন সত্তর টাকা মুনাফা পাওয়া।

ঃ তাহলে কি এর একটাও ঠিক নয়। এতে কি কোন ল্যাভ নেই?

ঃ অবশ্যই ঠিক লাভও আছে প্রচুর, তবে যথাস্থানে। এ ব্যবসার ব্যাখ্যা এগুলোর একটাও নয়।

ঃ তাহলে এ ব্যবসা যা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দানিবে তার ব্যাখ্যা কি?

ঃ তার ব্যাখ্যা বা যথার্থ সংজ্ঞা হলো ওটাই যা স্বয়ং ব্যবসার ক্রেতা সম্রাট এবং মুক্তির ঘোষণাকারী মহান আল্লাহ দিয়েছেন, তারই পরবর্তী আয়াতে, বলেছেন-

তা হলো- "তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের সা. প্রতি ঈমান আনবে আর আল্লাহর রাস্তায় মাল দিয়ে সাথে সাথে জান দিয়ে জিহাদ করবে। ইহাই কল্যাণ, যদি বুঝে থাকো।" এবার নিশ্চয়ই বাণিজ্যের আসল সংজ্ঞা বুঝতে পেরেছো যে, এ বাণিজ্য হিন্দবাদ আর সিন্দবাদের কল্পকাহিনী নয়। আর হাদিয়া তোহফাও নয়।

ঃ তাহলে তো বেঁচেই গেলাম। জিহাদতো আমি প্রতি দিনই করে থাকি। আমি শুনেছি জিহাদ মানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট করা। আর তাতো আমি প্রতিদিনই করে থাকি। সেই যে কনকনে শীতের আখেরী রাত, লেপ ছেড়ে ঠান্ডা পানিতে ওযু সেরে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যাওয়া, সে কি কম কষ্টের? তাছাড়া পাঁচ বেলা নামায, সারা দিন না খেয়ে একমাস রোযা রাখা। এ কষ্টতো আমার ছোট বেলার অভ্যাস।

ঃ আরে ভাই মুশকিল সাব! আমি মনে করেছিলাম তোমার মাথার স্ক্রু একটু ঢিলা। এখন দেখি স্ক্রুই নেই। শুনে রাখো- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এর প্রত্যেকটিরই কয়েকটি করে আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন- নামায কে ফরজ করা হয়েছে "আকিমুস সালাতা" বাক্য দ্বারা। আসলে সালাত-এর আভিধানিক অর্থ- দোয়া, রহমত, গুণগান, ক্ষমা, তেমনিভাবে রোযাকে ফরজ করা হয়েছে "কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম" বাক্য দ্বারা

আর সিয়ামের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। তেমনিভাবে হজ্জ মানে ভ্রমন আর যাকাত মানে পবিত্র করা। কিন্তু কোন ব্যক্তিই একথা বলবে না আর বললেও তা মানার নয় যে, শুধু দোয়া করলেই নামায আদায় হয়ে যাবে কিংবা বিরত থাকলে বা ভ্রমণ করলে আর কোন কিছুকে পবিত্র করলেই রোযা, হজ্জ, যাকাতের ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে। আজ কোন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে যদি কেহ একথার স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে যে কোন মুমিন বান্দা তাকে ভ্রান্ত বলতে বাধ্য। কিন্তু মুশকিল ভাই! যদি জিহাদের ব্যাপারে কেহ বলে জিহাদ কোন যুদ্ধ নয় স্রেফ কষ্ট করা তাকে কিন্তু ভ্রান্ত বলা হয় না। বলা হয় বুযুর্গ! মহা বুযুর্গ!!

ঃ আচ্ছা! তাহলে কি আপনি বলতে চান যুদ্ধ করার নাম জিহাদ?

ঃ আমি বলব কেন? তুমি কি বুঝতে পারছো না? ব্যবসা করতে বলা হয়েছে মালের সাথে জানের দ্বারা। আর জান দিয়ে বেচাকেনা হয় একমাত্র যুদ্ধের ময়দানে। কেন? তুমি বুখারী শরীফ খুলে দেখতে পার না? আল্লামা হজর ইবনে আসকালানী জিহাদের ব্যাখ্যা কি করেছেন? তিনি লিখেছেন, " আল জিহাদু, বজলূল জুহুদী ফি কিতালি মা'আল কুফ্ফার" অর্থ- জিহাদ হল কাফির গোষ্ঠীর সাথে স্বসস্ত্র যুদ্ধে শক্তি ব্যয় করা। হুযুর সা. এর জিহাদী জিন্দেগীতে নজর করলেও দেখতে পাই তিনি জিহাদের দ্বারা স্বসস্ত্র যুদ্ধকেই বুঝেছিলেন। তাঁর নির্দেশেই সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধের ময়দানে খুন ঝরিয়েছেন। বাচ্চাদের মাঠে নামিয়েছেন। সুতরাং আমরা বলবো- প্রকৃত জিহাদ কতলে কিতালের (লড়াইয়ের) নাম। পরিভাষায় জিহাদ রক্ত দেয়া আর নেয়ার নাম। যার মাঝে শাহাদত লাভ হয়, রক্ত ঝরে, কলিজা বিদীর্ণ হয়-চিবিয়ে খাওয়া হয়। দুশমনের বেড়ী ভাঙ্গা হয়। আভিধানিক অর্থের ঝড়ে পারিভাষিক বাস্তব জিহাদ উড়ে যেতে পারে না। কাদিয়ান মার্কা অর্থে আগুন লাগিয়ে দাও।

ঃ আরে এ আবার কি বললেন। কাদিয়ান মার্কা অর্থ আবার কি জিনিস? একটু খুলে বলুন ভাই।

ঃ কাদিয়ান মার্কা অর্থ বুঝলেনা? আরে, উপমহাদেশের বুকে যখন ইংরেজদের বিরদ্ধে শাহ্ আব্দুল আযীয এবং অন্যান্য উলামায়ে হক জিহাদের ফতুয়া দিলেন। তখন ইংরেজদের লালিত পুতুল মুসলমান আলেমের বেশে এসে ফতুয়া ঝাড়তে লাগলো, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বর্তমানে জিহাদ হারাম। ফতুয়া ছাড়াও সে বদবখ্ত জিহাদ নিয়ে অনেক কিছু বলে গেছে। যার দ্বারা সে জিহাদ কে শুধু কষ্ট স্বীকারের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করেছে। মজার ব্যাপার হলো এই বদবখ্তই পরবর্তীতে নবী হওয়ার দাবী করেছিল। এবং পায়খানায় তার আখেরী লীলা সাঙ্গ হয়েছিল। তার পুরো নাম- গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

ঃ আরে বলেন কি!! সে নুবুওয়াতীর দাবী করলো আর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তার কিছুই করলো না?

ঃ আহা! করেনি বুঝলে কি করে। করেছে বহু কিছুই। তবে আবু বকর রা. যেমনটি করেছিলেন মুসায়লায়লামার বিরুদ্ধে তেমনটি নয়। কারণ এ যুগে জিহাদী চেতনার বড়ই অভাব। জিহাদী প্রেরণায় মাঝে মধ্যেই লোডশেডিং দেখা দেয়। তোমার সাথে আমার এটা মূল আলোচনার বিষয় নয়; তবুও মনে পড়ে গেল তাই তারই একদিনকার একটি ঘটনা বলছি-

ভন্ডনবী গোলাম আহমদ আর উলামায়ে হকদের মাঝে এক বিরাট বাহাসের (তর্কযুদ্ধের) আয়োজন হলোঃ স্টেজের দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে আছে দুই বিপক্ষ দল। ভন্ডদল হতে স্বয়ং দলপতি কাজ্জাব আহমদ দাঁড়িয়ে বললো- আমার নুবুয়তীর সার্টিফিকেট আল্লাহ তার কুরানের আটাইশ পারাতে দিয়েছেন। সেখানে ঈসা আ. তাঁর কওমকে বলেছেন, "আমি এমন নবীর সংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম আহমদ।" আর আমিই হলাম সেই আহমদ। (নাউযুবিল্লাহ) হক দলে বসা ছিলেন যুগের কান্ডারী আল্লামা আতাউল্লাহ্ বুখারী, তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, হে বদবখ্ত! তোর নামতো গোলাম আহমদ; তা গোলাম শব্দটা গেল কোথায়?

জবাবে সে বলল ওটা আমি আপাতত বাদ রেখেছি। তখন আতাউল্লাহ (যার আতা বাদ দিলে থাকে শুধু আল্লাহ্) তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আর আমিও আপাতত আমার নামের আতা শব্দটা বাদ রেখে আল্লাহ হয়ে বলছি, তোর মত আহম্মককে আমি কখনো নুবুয়তী দেইনি।

যাই হোক ঘটনাটি বললাম তোমার মনে একটু আনন্দ দিতে। এবার মূল আলোচনার ইশকালে চলে যাই। ইশকালে মুশকিল আসান করো। তারপর পথ চলো নিঃশঙ্কোচে।

ঃ আচ্ছা ভাই মুজাহিদ! বাণিজ্য মানে কেনাবেচা আর একথা সর্ব স্বীকৃত যে, প্রত্যেক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একজন ক্রেতা আর একজন বিক্রেতা থাকবে। আর থাকবে বিক্রয়ের পন্য ও তার মূল্য এবং ক্রয় বিক্রয়ের একটি মার্কেট বা স্থান। তবে এ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কি তিমনটি আছে?

ঃ অবশ্যই আছে! এ ব্যবসার ক্রেতা মহান আল্লাহ, বিক্রেতা প্রত্যেক মুজাহিদ, পন্য তার জান-মাল, মূল্য তার জান্নাত, মার্কেট তার রণাঙ্গন। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

ঃ তবুও যে আমি সন্দিহান। স্পষ্ট হতে পারছিনা। একটু খুলেই বলুন না। কিভাবে এমনটি হতে পারে?

ঃ আরে তাইতো বলি, কুরআন হাদীসকে মন্থন করো। সব সন্দেহ ধুলো হয়ে যাবে। কেন কুরআনে আল্লাহ জানিয়ে দেননি, "নিশ্চয়ই আমি মুমিন বান্দাদের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছি জান্নাতের মূল্যে। তাদের জান-মাল ক্রয় করেছি যারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতপর তারা মারে ও মরে। ইঞ্জিল, তাওরাত, কুরআন এ তিন কিতাবেই তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে কে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী? সুতরাং তোমরা এ বেচাকেনার ব্যাপারে আনন্দিত হও যা আল্লাহর সাথে করছ। আর এ হলো মহান সাফল্য।" (সুরা তওবা-১১১ আঃ) সুতরাং ভাই মুশকিল সাব! বুঝতেই পারছ, জান-মাল ক্রয়ের স্থান আল্লাহ রণাঙ্গনকে নিযুক্ত করেছেন কি না। এখানে আল্লাহ্ এ কথা

বলেননি যে, যে কেহ যে কোন স্থানে জান-মাল দিলেই আল্লাহ তা কিনে নিবেন। বরং তিনি একথা বলেছেন, মুমিনদের মধ্য হতে তাদের জান-মাল, যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে এবং একই সাথে মারে ও মরে। এছাড়াও এ জান-মালের মূল্যে জান্নাতকে পাওয়ার স্থান আল্লাহর রাসুল তরবারীর নীচে বলেছেন। তিনি সা. বলেন, "আল জান্নাতু তাহতা জিলালিস সুয়ূফ" অর্থ জান্নাত হলো তরবারীর ছায়াতলে।

ঃ মুজাহিদ ভাই, ইতিপূর্বে আমি অনেকবার শুনেছি, আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। কিন্তু একথা তারা বলেননি যে, যারা যুদ্ধে মারবে ও মরবে তাদের জান-মাল, অন্যকারো নয়। তারা ভুল বলেছেন?

ঃ না তারা ভুল বলেনি, তবে আল্লাহর আয়াতে তারা লুকোচুরি খেলেছে। যেমন ভাবে অনেক নামাযে অনীহা প্রকাশকারীবা আল্লাহর আয়াতের দলীল দাঁড় করে বলে, আল্লাহ বলেছেন, "লা তাকরাবুস সালাতা...." মানে তোমরা নামাযের ধারে কাছেও যেওনা। কিন্তু তারা আয়াতের পরের অংশটুকু দেখে না যেখানে বলা হয়েছে- ওয়া আনতুম সুকারা" অর্থাৎ মাতাল অবস্থায়। ঠিক তেমনি করে জিহাদে অনীহা প্রকাশকারী লোকেরা শুধু আয়াতের প্রথম অংশ- আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করেছেন বলেই তার ব্যাখ্যা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন, আয়াতের দ্বিতীয় অংশ ভুলে ও বলতে চান না। অথচ একই আয়াতের দ্বিতীয় অংশেই আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়ের অবস্থা বলে দিয়েছেন। "ফা ইয়াক্‌তুলুনা ওয়া ইউক্বতালুন" অর্থাৎ মারা ও মরার কথা বলে দিয়েছেন।

ঃ আচ্ছা তাহলে জিহাদ অর্থাৎ ঐ ব্যবসা যা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দান করবে এবং ইহকালে আসন্ন বিজয় দিবে তার মোটামুটি অর্থটা কি দাঁড়ালো?

ঃ দাঁড়ালো ঐ কথায় যা ফতহুল বারিতে হাফেজে হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন। সেই পূর্বের কথাই; "আল জিহাদু বজলুল

জুহুদি ফী কিতালি মা'আল কুফ্‌ফার" অর্থ জিহাদ হলো কাফির গোষ্ঠীর সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে শক্তি ব্যয় করা।

ঃ আচ্ছা যদি কেহ মুজাহিদীনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির আঞ্জাম দেয় তাহলে কি সে জিহাদে অংশগ্রহণ কারী বলে বিবেচিত হবে?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ তাহলে জিহাদের যথাযথ সংজ্ঞা বিস্তারিত ভাবে কি হবে?

ঃ তাহলে জিহাদের যথাযথ সংজ্ঞা-মাওলানা মাসউদ আযহার রচিত 'ছোটদের জিহাদ শিক্ষা' এর প্রথম জিজ্ঞাসার জবাবেই খুঁজে পাবে।(এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য)

ঃ আচ্ছা মুশকিল ভাই! আলাপতো অনেক হলো। তা, তোমার মাথার অবস্থাটা কেমন হল, এখন একটু বলোনা।

ঃ ও তাই! বেশী ভাল না, তবে আগের তুলনায় কিছুটা চাঙ্গা মনে হচ্ছে। ইশকালের বোঝা কিছুটা হালকা মনে হচ্ছে। আপনার আলোচনা শুনতে থাকলে হয়তো আরো পরিস্কার হয়ে যাবে আমার পথ। এতক্ষণ যা শুনলাম-বুঝলাম তাতো প্রায় সবই জিহাদের সংজ্ঞা বিষয়ক। জিহাদের বিধান সম্পর্কে যে কত ইশকাল আমার মাথায় জায়গা করে নিয়েছে, তাতো বলিনি। বলতে সাহস ও পাচ্ছি না। কারণ জিহাদ সম্পর্কে যে এতো কথা কুরআনে আছে তা আমার ধারণাতে ও ছিল না। সুতরাং আমি অজ্ঞ। আর আপনি অজ্ঞতাকে সইতে পারেন না। জানি না জিহাদ সম্পর্কে আরো কত না আয়াত রয়েছে। অভয় দিলে ইশকালের মাধ্যমে জানতে চাইতাম।

ঃ নিশ্চই আপনি নির্ভয়ে ইশকাল করতে পারেন। আমি সব অজ্ঞ ব্যক্তিকে সইতে পারি না এমনটি নয়। যাদের জানার স্পৃহা আছে তারাই আমার প্রকৃত বন্ধু। আমি সইতে পারি না ঐ অজ্ঞদের যাদের ঘাড় মোটা। নিজে যেটা বুঝে সেটাই ঠিক। কিছু জানার চেষ্টা করে না। কুরআনের দলীলের

চেয়ে বুযুর্গদের দলীল যাদের কাছে বেশী প্রিয়। অথচ বুযুর্গরা তাদের কথাকে দলীল বানাতে বলেননি। কিন্তু তুমিতো জানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছো, তোমাকে সইতে পারবো না তা ভাবা ঠিক নয়। নিশ্চিন্তে ইশকাল চালিয়ে যেতে পারো।

বিধান নিয়ে কথাঃ

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! জিহাদ কি ফরয না নফল, এ ব্যাপারে তো কিছুই বললেন না। বললে এর বিধান সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতাম।

ঃ তুমি কি উসুল বা ইসলামের মূল নীতি সম্পর্কে কোন ধারণা রাখো? যদি ঐ ইলমের সাথে কিছুটা সম্পর্ক ও থেকে থাকে তাহলেই আমার এ আলোচনা অতি সহজে বুঝতে পারবে। অন্যথায় একটু কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ঃ উসুল বিষয়ক একটি কিতাব পড়েছিলাম বহু পূর্বে। সে পড়াটা আমার পরীক্ষায় খানার নম্বর তোলার জন্যই ছিল; সেই পড়াটার বদৌলতে বোর্ডিং-এ ফ্রী খানা খেতে পেরেছিলাম। এখন বর্ডিং-এর খানার খাই না। আর ওটাও পড়িনা। না পড়তে না পড়তে এখন এক রকম ভুলেই গেছি। সুতরাং ঐ দূর্বল পয়েন্টে আঘাত করে লজ্জা দিবেন না।

ঃ আচ্ছা তাহলে দেখছি মুশকিল সাব মাদ্রাসায়ও পড়েছে। তা মাদ্রাসায় পড়ার পরেও এতো ইশকাল মাথায় কি করে আশ্রয় নিলো। ওখানে তো কুরআন হাদীস বেশ ভাল করেই পড়ানো হয়। আলোচিত আয়াত কি কখনো নজরে পড়েনি?

ঃ আবার সেই দূর্বল পয়েন্টে আঘাত। বললাম তো আমার মাদ্রাসা পড়া কেবল পড়ার জন্যই পড়া ছিল। জানার জন্য নয়। আর জানার জন্য যতটুকু চেষ্টা চালিয়েছি তা কেবল পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার জন্যই ছিল। পরীক্ষার আগে খুব পড়েছি, পরীক্ষায় ভাল নম্বরও তুলেছি। পরীক্ষা চলে গেছে সেই অর্জিত এলমও উধাও হয়ে গেছে। গবেষণার জন্য পড়ে

থাকলে হয়তো এখনো মনে থাকতো। সুতরাং এখন আপনি যা কিছু বলছেন, সবই আমার কাছে নতুন মনে হচ্ছে। সুতরাং উসুলের ব্যাপারেও এর ব্যাতিক্রম নয়। এ ব্যাপারেও নতুন করে আলোচনার আবেদন করছি।

ঃ বিস্তারিত উসুল নিয়ে তোমার সাথে আলোচনায় যাবো না। ফরয বিধান কায়েমের ব্যাপারে যেই মূলনীতি বা উসূল রয়েছে সেটাই বলছি। কারণ ওটাই আমাদের চলমান আলোচনার মূল বিষয় বস্তু তোমার এখনকার ইশকাল হলো জিহাদের বিধান নিয়ে। তুমি প্রশ্ন করেছো জিহাদ ফরয না নফল। উত্তরে আমি বলবো- জিহাদ ফরজ। কেননা ফরয বিধান কায়েম হয় তিনটি জিনিস দ্বারা। এক- সরাসরি কুরআনে আল্লাহর আদেশ সূচক শব্দ দ্বারা। দুই- ফেয়েলে মাজহুল দ্বারা। তিন- হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা। আর জিহাদ সম্পর্কে এ তিন ধরণের বাণীই বর্তমান। অথচ এ তিন ধরণের যে কোন এক ধরণের বানীই এর ফরয প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল।

ঃ আচ্ছা! আল্লাহ সরাসরি আদেশ করেছেন এমন একটি আয়াত শুনাবেন কি? শুনালে কৃতজ্ঞ হতাম।

ঃ অবশ্যই শুনাবো! আল্লাহ সূরা হজ্জের ৭৮ নং আয়াতে আদেশ করেছেন- তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় যেমন ভাবে করা উচিত।

ঃ মুজাহিদ ভাই! কিছু মনে করবেন না। আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা পড়েছি। তাফসীরে মাআ'রেফুল কোরআনে লিখা আছে, জিহাদ শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কোন কোন তাফসীর কারকের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি বিধান পালনে পূর্ণশক্তি ব্যয় করা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তা পালন করা। যাহহাক এবং মুকাতিল (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত ও ইবাদত কর যেমন করা উচিত।

ঃ আরে ভাই মুশকিল সাব! আমিও যে এ ব্যাখ্যা পড়িনি তেমনটি নয়। পড়ে পরে বুঝে শুনেই তোমার সামনে এ আয়াত তুলে ধরেছি। আমার দেখার ছিল অন্যান্য জিহাদ বিদ্বেষীর ন্যায় তুমি পরিভাষার জিহাদ কে উড়িয়ে দিতে শাব্দিক জিহাদের পয়েন্টগুলি আয়ত্ব করে রেখেছ কি না। তা দেখছি অন্যান্য আয়াতে গাফেল হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বেশ সময় দিতে পেরেছ। তবে তুমি দেখেছ কি না জানিনা, অনেকে কিন্তু স্বসস্ত্র যুদ্ধে শক্তি ব্যায়ের কথাও এ আয়াতে এনেছেন। এছাড়া ও বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ জিহাদের আদেশ করতে গিয়ে এমন শব্দের প্রয়োগ করেছেন যেখানে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার সুযোগই পাবে না।

ঃ আহা! আমিতো সেই আয়াত্ই শুনতে চাই, যেখানে আল্লাহ এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

ঃ আল্লাহ বলেছেন, "ওয়া ক্বাতিলুহুম হাত্তা লা-তাকূনা ফিতনাহ্; ওয়া ইয়াকূনাদ্দীনু লিল্লাহ্" অর্থ- আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা মিটে যায়। (সূরা বাকারা-১৯২ আয়াত) এখানে আল্লাহ কতল শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার ধাতুর মধ্যেই রয়েছে হত্যা করা। আর হত্যাতো একমাত্র স্বসস্ত্র যুদ্ধেই হয়ে থাকে।

ঃ আচ্ছা! এবার ফেয়েলে মাজহুল দ্বারা কিভাবে জিহাদ ফরয হলো একটু বুঝিয়ে দিন না।

ঃ আচ্ছা! আমরা যে রমযান মাসে ত্রিশ রোজা রাখি, এটা ফরয হয়েছে কিভাবে জান?

ঃ না, জানিনা।

ঃ এটা ফেয়েলে মাজহুল দ্বারা ফরয হয়েছে, বলা হয়েছে "কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু" অর্থ- তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে। আর এই হুকুমের অনুস্মরণেই তামাম মু'মিন বান্দারা রোজা রেখে

থাকেক। ঠিক অনুরুপ মাজহুল দ্বারাই আল্লাহ লড়াইকে ফরয করেছেন। বলা হয়েছে "কুতিবা আলাইকুমুল কিতালু" অর্থ- তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরয করা হয়েছে। আর আমার দয়াময় আল্লাহ কতই না সতর্ক, তিনি পূর্ব থেকেই জানতেন উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও কিছু লোক বনী ইস্রাঈলের মত যুদ্ধকে অপসন্দ করবে। তাই আল্লাহ যুদ্ধ বিধানের সাথে সাথেই সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে দিয়েছেন। "তোমাদের তরে যুদ্ধ বিধানকে ফরয করা হলো, অথচ তোমাদের কাছে তা অপসন্দনীয়, পক্ষান্তরে, তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পসন্দসই নয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দময় অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ তোমরা কিছুই জান না আল্লাহই ভাল জানেন। (যিনি বিধান করেছেন) সূরা বাকারা-২৪৩ আয়াত॥

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! জিহাদ সম্পর্কে প্রথম যে আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে তাতে কি জিহাদ শব্দ এসেছে না কিতাল শব্দ?

ঃ তাতে কিতাল শব্দেরই অবতারণা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'উজিনা লিল্লাজিনা ইউক্বাতিলূনা" অর্থ- তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল সশস্ত্র যুদ্ধের। (সূরা হজ্জ- ৩৯ আয়াত)

যুদ্ধ ফরয হওয়ার ব্যাপারে এখানে মাত্র তিনটি আয়াত আলোচনা করা হলো এছাড়াও বহু আয়াত এ সম্পর্কে এসেছে পাক কুরআনে। সময় সল্পতার কারণে তার আলোচনা সম্ভবপর হলো না।

সর্বযুগে জিহাদঃ

ঃ এবার হাদীসের পালা। এবার হাদীস দ্বারা জিহাদের ফরযিয়্যত প্রমাণ করলে ভাল হয়।

ঃ হায়রে মুশকিলের ইশকাল! কতো কুরআনের আয়াত বেটে খা ওয়ানো হলো তার পরেও আবার হাদীসের বায়না ধরে বসে আছে।

ঃ না, না, মুজাহিদ ভাই! রাগ করবেন না। জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে আমার সকল ইশকাল দফা হয়েছে। শুধু ইল্ম চর্চার তাগিদেই হাদীসের কামনা করছি। তবে মুজাহিদ ভাই, ইশকালের বিরাট একটা অংশ এখনো মাথার একপাশে ভন-ভন করে ঘুরছে। আর তা হলো জিহাদের শর্ত সংক্রান্ত ইশকাল। আশাকরি তাও আসান করে আমাকে আপনার সঙ্গী করে নিবেন। এবার জিহাদ সংক্রান্ত হাদীস......

ঃ শুনো! জিহাদ ফরয। এর প্রমাণে বহু হাদীস রয়েছে। কুরআনের আয়াত দ্বারা জিহাদ ফরয প্রমাণিত হবার পর হাদীস উল্লেখ করা একদিকে যেমন নিষ্প্রয়োজন অন্য দিকে তা বর্ণনা করতে গেলে বইয়ের পরিসরও বহু দীর্ঘ হয়ে যাবে। সেহেতু এখানে একটি মাত্র হাদীস উল্লেখ করছি। হুযুর সা. বলেছেন, "উমিরতু আন উক্বাতিলান্নাসা হাত্তা ইয়াশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ওয়া ইউকিমাস সালাতা ওয়া ইউতায্ যাকাতা" অর্থ- আমাকে মানুষের সাথে লড়াই করতে আদেশ করা হয়েছে; যতক্ষণ না তারা সাক্ষী দিবে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আরো একটি হাদীস শুনে রাখো- হুযুর সা. বলেছেন, "আল জিহাদু মাযীন ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ" অর্থ জিহাদ চলতে থাকবে আখেরী লীলা সাঙ্গ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। অন্য হাদীসে আছে, দাজ্জাল কতলের আগ পর্যন্ত এই জিহাদকে কোন যালিমের যুলুম বা অতি নীতিবানের নীতি বন্ধ করতে পারবে না। এবার মুশকিল ভাই কেমন লাগছে? একটু মনের ভাবটা প্রকাশ করনা।

ঃ আসলে মুজাহিদ ভাই! এই আয়াত ও হাদীসগুলো আমার জিহাদ সম্পর্কীয় আনেক হয়রানি দূর করে দিয়েছে।

ঃ তাহলে ইশকাল মুক্ত হতে পেরেছো?

ঃ তা কিছুটা। তবে মনের অবস্থা এখনো সুবিধাজনক নয়। আগে জানতাম আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে আমার জান-মাল ক্রয় করেছেন।

জান্নাত আর যায় কোথায়? যথাসাধ্য তা যেথায় যেভাবেই হোক ব্যয় করবো আর জান্নাতটাকে লুফে নিবো। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থা জীবন নেয়া এবং দেয়া এটা আগে পড়িনি ভালই ছিল। এ মারামারি রক্তপাত আমার মনঃপুত হচ্ছে না। যদিও দেখছি এটা পরিস্কার ভাবে কুরআনে বর্ণিত আছে। আর এটা খারাপ লাগবে তাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। আরো বলেদিয়েছেন তোমাদের এ খারাপ লাগার মধ্যে লুকায়িত তোমাদের কল্যাণ। এতো স্পষ্ট বর্ণনার পরেও আমার মন শুধু তাদের কথায় সায় দিচ্ছে যারা বলে এ যুগে অস্ত্রের এ ছোট জিহাদ (যুদ্ধ বিগ্রহ) নেই। এযুগে চলবে জিহাদে আকবার অর্থাৎ ঘরে আর মসজিদে বসে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। রক্ত পাতের কথা শুনলেই আমার গা শিহরিয়ে উঠে।

ঃ শুন মুশকিল সাব! ছোট জিহাদ বড় জিহাদ নিয়ে সমাজে বেশ তর্ক বিতর্ক রয়েছে। যুদ্ধ জিহাদকে ছোট আর নফসের জিহাদকে বড় দেখানোর স্পষ্ট কোন হাদীস বা আয়াত আজো কেউ দেখাতে পারেনি। এনিয়ে তোমার সাথে পরে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই আলাপ হবে। তবে তোমার অবস্থার উপর আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল, তা না বলে পারছি না।

দুধ খাওয়া মজনুর ঘটনাঃ

ঃ গল্প! আচ্ছা বলুন, বলুন। অনেক্ষণ আলাপ হলো, একটা গল্প না হলেই বা কেমন হয়।

ঃ অযথা গল্প দু'শ বলাতে ও ফায়দা নেই। আর কাজের গল্প একটা হলে ও তাতে লাভ রয়েছে। আমি তোমার লাভের জন্যই একটা গল্প বলছি। আমার গল্পের শিরোনাম 'দুধ খাওয়া মজনু'।

ঃ সে আবার কি? দুধ খাওয়া মজনু কি জিনিস?

ঃ আরে তাইতো বলতেছি! শুন, লাইলী-মজনুর প্রেম কাহিনী হয়তো শুনে থাকবে- লাইলী এক রূপসী ষোড়ষী রাজকন্যার নাম আর তারই প্রেমে পাগল প্রেমিকার নাম মজনু। এ মজনু আবার দুই প্রকার এক হলো দুধ খাওয়া মজনু আর দুই নম্বরে হলো রক্ত দে ওয়া মজনু।

ঃ এ আবার কেমন কথা?

ঃ আরে এটাইতো গল্পের রহস্য। লাইলীর প্রেমে মজনু পাগল আর মজনুর প্রেমে লাইলী। তাদের উভয়ের প্রেম যখন চরমে উঠলো তখনই লাইলীর সম্রাট পিতা তাকে বিবাহ দিয়ে দিল অন্য এক রাজার সাথে। কিন্তু লাইলীর আকর্ষণ তখন ও মজনুর প্রতি। আর মজনু বিরহ বেদনায় পাগল বেশে বনে জঙ্গলে পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। লাইলীর থেকে বিবাহিত স্বামী তার অধিকার আদায়ে সক্ষম হলো না। লাইলী রাজমহলে বন্দিনী হয়ে প্রতিদিন তার খাদেমার দ্বারা মজনুর কাছে একগ্লাস দুধ পাঠাচ্ছে আর খাদেমাকে বলে দিচ্ছে তুমি বলবে এ লাইলীর পক্ষ থেকে তোমার জন্য প্রেমের উপহার। সে তোমারী জন্য আজো পাগল পারা। খাদেমা যেই দুধ নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে চলে তখনই জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকজন নকল মজনু। তারা বলে আমরাই লাইলীর প্রেমিক। বোকা খাদেমা তাদেরকেই দুধ খাইয়ে চলে আসে রাজ প্রাসাদে। এমনি ভাবে দিন কতেক চলতে থাকে। হঠাৎ লাইলীর মন বলে উঠে- না, আমার মজনু তো এত ধারে কাছে নয় যে, খাদেমা এতো দ্রুত চলে আসবে। পথে হয়তো নকল মজনুর মেলা বসেছে। একবার পরীক্ষা করা যাক। এবার লাইলী খাদেমাকে একটি পেয়ালা আর একটি ধাঁরালো ছুরি দিয়ে বলল যাও, আজ মজনুকে বলবে লাইলীর রক্ত প্রয়োজন। খাদেমা চলে এলো জঙ্গলের কিনারায়। দুধ খেতে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে নকল মজনুরা। খাদেমা বলল, আজ লাইলী দুধ পাঠায়নি, সে রক্ত চেয়েছে। এই নিন ছুরি আর পেয়ালা। রক্তের কথা শুনে ছুরি আর পেয়ালা দেখে নকল মজনুদের গা শিহরিয়ে উঠল। তারা বলল হায়রে বোকা, মজনু দুই প্রকার, এক- দুধ খাওয়া মজনু; আমরা হলাম সেই মজনুর দল। আর রক্ত দেয়া মজনু

তো ঐ জঙ্গলের ভিতর থাকে। খাদেমা জঙ্গলের ভিতর চলে গেল। দেখতে পেল বহুদিনের না খাওয়া এক পাগল। মাথায় উস্কো-খুস্কো ঝাঁকড়া চুল। জঙ্গল মাড়াচ্ছে আর লাইলী লাইলী নাম জপে যাচ্ছে। খাদেমা তাকে বলল, আয় মজনু! লাইলী তোমার রক্ত চেয়েছে। লাইলীর নাম শুনতেই মজনু আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠল, কি বললে, লাইলী আমার রক্ত চেয়েছে? এই বলেই সে ছুরি নিয়ে দেহে চালিয়ে দিল। অনাহারে ক্লীষ্ট জীর্ণ-শীর্ণ দেহ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়তে লাগল পেয়ালায়। তার দেহ শিহরিয়ে ওঠেনি। বরং লাইলীকে রক্ত দিতে পেরে সে আনন্দ পেয়েছে। কারণ দুধ খাওয়া মজনু নয় সে; আসল প্রেমিক মজনু।

মুশকিল সাব! মুমিন বান্দাও দুই প্রকার। এক প্রকারের মুমিন 'জিলাপী খাওয়া' মুমিন। তারা জান্নাত চায় তবে জান্নাতের দাম দিতে চায় না। মানে জান দিতে চায় না। আরেক প্রকারের মুমিন রয়েছে যারা খোদা প্রেমে জান উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। হাসি মুখে রক্তদানে শাহাদতের পেয়ালা পানে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত নয়। কতল-কিতালের নাম শুনলেই যতদিন তোমার গা শিহরিয়ে উঠবে; ততোদিন তুমি মনে করবে আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক হতে পারনি। যুদ্ধ ফাসাদ নয় রহমত কেননা এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে মানুষ সুন্দরতম জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! আপনি দেখছি ভাল গল্প বলতে পারেন। আপনার কথা শুনতে খুব ভাল লাগে, তবে মাঝে মাঝে অন্তরে চোট লাগে। কিন্তু করার কিছুই নেই। কারণ কথাতো সত্য; যুক্তিযুক্ত। আপনার গল্পে আমার মনে যে আঘাত লাগতেছিল, সে আঘাতে মনের দরজা খুলতে শুরু করেছে। বুকে যেন বড় বল পাচ্ছি। দিনে দুপুরে স্বপ্ন দেখছি। সুন্দর ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন।

ঃ তুমি আসলে লোক ভাল। মনের ইশকাল মনে চাপা রেখে গোড়ামী

করতে চাওনা। সব খুলে দিয়ে কুরআন হাদীসের মন্ত্রণায় চাঙ্গা হতে চেষ্টা কর। অনেকে কিন্তু এমনটি করে না। তাদের নিয়েই যতো আপদ আর বিপদ। আবার অনেকে কুরআন হাদীসের জিহাদী বর্ণনা শুনে মনটাকে বাঁকা রেখে; তাদের কিন্তু কুরআনের শত আয়াত বেটে খাওয়ালেও অন্তর সিদ্ধ হবে না।

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! আমি মেনে নিলাম জিহাদ ঠিকই ফরয; তবে তার জন্য সময় আছে। সব সময়েই যে জিহাদ চালাতে হবে এমনটি তো কথা নেই।

ঃ আরে! তেমন কথা নেই কে বলল? কেন একটু আগে যেই হাদীস বলা হলো তা কি এখনই ভুলে গেলে? বলা হয়েছে- আল জিহাদু মাজিন ইলা ইয়া ওমিল কিয়ামাহ। জিহাদের জন্য কোন বেলা অবেলা নেই। তা জারী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আবু দাউদ শরীফে ও মিশকাতের ১৭-১৮ পৃষ্ঠায় আরেকটি হাদীসের অবতারণা হয়েছে- হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর সা. বলেছেন, "ঈমানের মূল হতে তিনটি বিষয় হলো এইঃ এক- যে বলে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই তাকে ছোট খাট পাপের কারণে কাফের বলা যাবে না। এবং তাকে ইসলাম থেকে বের করে না দেয়া। এ ব্যাপারে খুব চৌকন্না হওয়া। দুই- আমাকে প্রেরণ করা থেকে নিয়ে এই উম্মতের শেষ লগ্নে দাজ্জালের হত্যা করা পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে। কোন জালিমের জুলুম নীতিবানের নীতি এই জিহাদের হুকুমকে বাতিল করতে পারবে না। তিন- ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" আর হাঁ কুরআন ও জিহাদের সময় সীমা সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছে। বলা হয়েছে- "তোমরা যুদ্ধ-জিহাদ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা দুরিভুত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর না হয়।" এবার বলো; দুনিয়াতে ফিতনা আছে কি-না। যদি ফিতনা আর মেকি প্রভূদের মতবাদ থেকে থাকে তাহলে জিহাদ পরিত্যাগ করার কোন রাস্তাই খোলা থাকেনা। জানিনা, তুমি কিভাবে বলতে পারো এযুগে জিহাদ চলতে হবে এমনতো কথা নেই। হাঁ, এক সময় জিহাদ থাকবে না। সে তো কিয়ামতের পর।

প্রকার ভেদ ঃ

ঃ আরে! আমি তো ভাই বলতেছিলাম জিহাদ সবার জন্য সব সময় করতে হবে এমনটি নয়। কেননা, জিহাদ হলো ফরযে কিফায়া। কতেক লোকের করনের মাধ্যমেই সবার থেকে আদায় হয়ে যাবে। আমি নুরুল আলম রামুজীর লেখা 'ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ' বইটিতে পড়েছি, জিহাদ ফরযে কিফায়া। তিনি মিশকাত হতে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, "হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর আকরাম সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করেছে, রমযানের রোজা রেখেছে আল্লাহ পাকের কর্তব্য (ইহসান স্বরূপ) তাকে যেন জান্নাতে দাখিল করেন। সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুক বা নিজ বাসস্থানে বসে থাকুক।" এ হাদীস উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন এর দ্বারা প্রমাণিত জিহাদ ফরযে কিফায়া, আর পাঁচ রুকন ফরযে আইন।

ঃ দেখ, মুশকিল ভাই! জিহাদ ফরযে কিফায়া একথাতো ঠিক। কিন্তু এটাতো সার্বক্ষণিকভাবে। কখনো কখনো যে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় এটা দেখার সৌভাগ্য কি তোমার হয়নি? বিদ্যা-বুদ্ধিতো জুগিয়েছ ঠিকই, কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে জিহাদ থেকে গা বাঁচানোর জন্য, রাগ করোনা কিন্তু ভাই! এই হাদীসেরই শেষাংশে মুজাহিদদের যে মর্তবা-সম্মানের কথা বলা হয়েছে তাও একটু দেখে নিও তাহলে হয়তো জিহাদের আগ্রহ কিছুটা বেড়ে যাবে। আরো শুন, জিহাদ যে ফরযে কিফায়া একথা যেমন ঠিক, আবার ফরযে আইন একথাও তেমনি শুদ্ধ। অবস্থা দৃষ্টে এর ফতুয়া বের হয়ে আসবে।

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! কোন অবস্থায় ফরযে কিফায়া আর কোন অবস্থায় ফরযে আইন এবং বর্তমান পেক্ষাপটে এর হুকুম একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

ঃ কোন অবস্থায় কিফায়া আর কোন অবস্থায় ফরযে আইন সেটা আমি নিম্নে প্রবন্ধ আকারে তুলে ধরছি সেখান থেকে তুমিই ফতুয়া বের করতে পারবে। বর্তমান সময়ে কোন স্থানে কোন ফরয।

হক বাতিলের সংঘর্ষ চিরন্তন। যেখানেই তাগুতী আগ্রাসন, সেখানেই খোদায়ী শক্তির বিস্ফোরণ। ফিরআউন জাগছে তো মুসার লাঠি হাঁকছে। আবু জেহেল মাথা তুলছে অমনি মুহাম্মদী মিশন তার অবসান ঘটিয়েছে। এটাই নিয়ম বাতিলের নিপাতে হক পন্থীরা আমরণ লড়াই চালিয়ে যাবে এটাই খোদার সুন্নত, মাওলার বিধান। তিনি সকল মানবকে সামনে রেখে ফরমান পেশ করেছেন- "হে আমার ঈমানদার বান্দারা! তোমরা নিকটবর্তী কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ জিহাদ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে নাও আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা তাওবা-১২৪ আঃ)

এখন প্রশ্ন দাঁড়ালো, এ লড়াই কি ফরযে আইন না কি ফরযে কিফায়া। ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমুআয়ে ফতুয়ার প্রথম খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, যদি অমুসলিম গোষ্ঠী মুসলমানদের উপর আঘাত হানতে ষড়যন্ত্র আঁটে তবে এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া সবার উপর কর্তব্য। এবার আমরা বিশ্বনন্দিত গ্রন্থ বেদায়া সানায়া ও বাহরুরায়তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেখানে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনে আবেদীন লিখেন, কোন ইসলামী সীমান্তে যদি কুফরী শক্তি আক্রমন করে তবে আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলমানদের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরযে আইন। আর দূরে অবস্থানকারীদের ক্ষেত্রে হুকুম হলো, আক্রান্ত ভূমির ব্যক্তিরা দূরবর্তীদেরর সাহায্য ব্যতীত দুশমনের মোকাবেলায় যদি যথেষ্ট হয়; তবে দূরবর্তীদের তাদের সাহায্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরযে কিফায়া। আর যদি আক্রান্ত ভূমির ব্যক্তিদের একার পক্ষে মোকাবেলা সম্ভব না হয় তবে দূরবর্তীদের সেখানে জিহাদে অংশ নেয়া ফরযে আইন। অনুরূপ ফতুয়া অন্যান্য মনীষীগণও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আরেকটি উদ্ধৃতির অবতারণা করছি। তিনি বলেন, "লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” এর প্রতি ঈমান আনয়নের পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে অগ্রগামী শত্রুকে প্রতিহত করা। যারা মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকে ধ্বংস সাধনে উদ্যত হয় এবং তাদের নীচু করে রাখতে চায়। (আল ফতুয়াউল কুবরা- ৪র্থ খণ্ড)

মোট কথা যে যায়গায়ই আগ্রাসী শক্তির আক্রমন হবে সেথায়ই জিহাদ ফরযে আইন। আর সব সময় সব স্থানে সর্বাবস্থায় দাওয়াত দিয়ে সাড়া না পেলে এবং জিযিয়া দানে সম্মতি না পেলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরযে কিফায়া এবং যখন কোথাও ইসলামী শক্তি বিজয়ী রূপে বিরাজমান থাকবে; মুসলিম নারীর সম্ভ্রম হারাবার আশঙ্কা থাকবে না; শিশুদের রক্ত নিয়ে হোলী খেলার অবকাশ থাকবে না এবং পবিত্র স্থান সমূহের সম্মান থাকবে অক্ষুণ্ন; সেখানকার মানুষের জন্য অন্যত্র জিহাদের অভিযান চালানো হবে ফরযে কিফায়া। পক্ষান্তরে, যদি ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম জনপদেও শত্রুবাহিনী আক্রমন চালায় তবে সেখানকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আর যদি তারা অলসতা বশতঃ জিহাদ থেকে বিরত থাকে তবে এ ফরয তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর বর্তায়। তারা গাফেল হলে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসী এ ফরয আদায় করবে। এমনি ভাবে ফরয গোটা পৃথিবী বেষ্টন করে নিবে। কেননা, সকল ইসলামী জনপদ একটি নগরীতুল্য। ইসলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে জিহাদ ফরযে কিফায়াহ্, এমন বক্তব্য ফিকাহ্, তাফসীর, হাদীস, উসূল, ফতুয়ার কোন কিতাবেই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু দুঃখ হলো এযুগের কতেক মুসলমানকে এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বে পেয়ে বসেছে। এই হলো আমার নিবন্ধ। এবার বুঝে নাও বর্তমান প্রেক্ষিতে জিহাদ ফরযে আইন না কিফায়াহ্।

ঃ মুজাহিদ ভাই! আপনার এ নিবন্ধে দুই ধরণের জিহাদ দেখা গেল। একটি হলো- আগে বেড়ে আক্রমন করা অপরটি হলো আক্রমনের পর জবাবী আক্রমন করা। শরীয়তের পরিভাষায় এ দু’টির আলাদা কোন নাম আছে কি?

ঃ হাঁ, অবশ্যই এ দু'টির আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। প্রথমটি হলো- 'ইক্বদামী' আক্রমণাত্মক যুদ্ধ দ্বিতীয়টি হলো 'দিফায়ী' প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। ইসলামে এই দুই প্রকার যুদ্ধই ফরয। তবে, একটি কেফায়া অপরটি আইন। যা উপরে আলোচিত হয়েছে। আমরা কিন্তু আলাপ করতে করতে জিহাদের প্রকার ভেদের আলোচনায় চলে এসেছি।

ভারত বার্মায় কোন জিহাদঃ

ঃ তাই নাকি! প্রকারভেদ নিয়ে কিন্তু আমার বিশেষ ইশকাল আছে।

ঃ আরে, থাকবেইতো, মুশকিল সাব যেহেতু ইশকাল থাকবেনা তো থাকবেটা কি? কোন চিন্তার কারণ নেই আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এবার আমাকে একটু বলে দাওনা হিন্দুস্তানের জমীনে কোন জিহাদ চলবে? ইকদামী না দিফায়ী।

ঃ তা আমি কিভাবে বলব, আপনিই বলে দিন না।

ঃ কেন তুমি বলতে পারবে না? আমি কি ইকদামী আর দিফয়ীর প্রেক্ষাপট বলে দেইনি?

ঃ বলে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমি হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যেমন গাফেল বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ও তেমন কিছু জানি না। ফতুয়া দিব কিভাবে?

ঃ তা জানবে কেন? আর জানো বলেইতো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারোনা। শুনে রাখো, যেখানেই একবার ইসলামের বিজয় ডংকা বেজেছে কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আবার তা কেড়ে নিয়েছে; সেখানেই দিফায়ী জিহাদ ফরয। যা ফরযে আইন বলে বিবেচিত। আর হিন্দুস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো এই-

প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকেরা হিন্দুস্তান বলতে বর্তমানের ভারত,

পাকিস্তান, বার্মা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ সবটাকেই বুঝতো। বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশটি আজ হতে বারশত বছর পূর্বে এক বিশাল রাজ্য বলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশ্চিমে মাকরান পূর্বে রাজপুতানা উত্তরে মুলতান পেরিয়ে পাঞ্জাব এবং দক্ষিনে আরব সাগর ও গুজরাট পর্যন্ত তার এলাকা ছিল বিস্তৃত। উল্লেখ্য, হিন্দুস্তানের মধ্যে এ জমীনেই প্রথম ৮৯ হিজরীতে টগবগে তরুন বীর বাহাদুর মুহাম্মদ বিন কাসিম পদার্পণ করেন এবং সদর্পে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে মাধ্যমে হিন্দুস্তানের ভূমিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম করে দেন। এর পর পালাক্রমে (৩৯১-৪২১ হিজরীতে) সুলতান মাহমুদ গজনবীর হাতে পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, ইউপি, মুলতান, কাশ্মির, মিরাঠ, রাজপুতানা নগরী সমূহ এবং মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ গজনবীর হাতে দিল্লীতে তদপর মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর হাতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এবং আসাম-তিব্বতে। সর্বশেষে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর হাতে হিন্দুস্তানের বাকী অংশ দাকান, সেহেলকার, দুরাইল দক্ষিন হিন্দের বার্মা ইত্যাদি এলাকাতে ইসলামের বিজয় ডংকা বেজে উঠে। এরপর একাধারে প্রায় আটশত বৎসর কাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানে মুসলমানরাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু হটকারী ইংরেজ সম্প্রদায়ের হটকারীতায়, মীর জাফরদের বিশ্বাস ঘাতকায় মুসলমানরা তাদের এ সাজানো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। ফলে এ হতভাগ্য জাতির সামনে নেমে আসে লাঞ্ছনাকর জীবন। মূলকথা; হিন্দুস্তান হলো মুসলমানদের হারানো রাজ্য। বহিরাগত কর্তৃক আক্রান্ত রাজ্য। আর এ কথা পূর্বেই বলেছি এখনো বলছি- ফিকাহ্‌বিদগণের মতে আক্রান্ত রাজ্যে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বা জিহাদে দিফায়ী ফরয হয়। আর জিহাদে দিফায়ী হলো ফরযে আইন।

মুশকিল সাব এতক্ষণ অধীর আগ্রহে হিন্দুস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনছিল। শুনে অবাক হয়ে গেল এবং বলে উঠলো-

ঃ আরে! এ দেখছি মুজাহিদরা শুধু অস্ত্রই চালাতে পারেনা; তারা ইতিহাসও পড়ে। তদুত্তরে মুজাহিদ বলল-

ঃ আরে! এতো সাধারণ কথা যে, যে জাতি তার ইতিহাস জানে না তারা কভু উন্নতি করতে পারে না। আর আমি যে ইতিহাস বললাম, এতো আমাদের কেমন যেন জন্মভূমির ইতিহাস। ইরান, তুরান, স্পেন, তরস্ক ইত্যাদি বহির্বিশ্বের ইতিহাসের সামনে তো আমরা একেবারেই পাতিহাঁস। হায়! জানিনা প্রভূ আমাদের এ তন্দ্রাকেক কবে দূর করবেন।

আরাকান পর্ব

দৈহিকও সামাজিক নির্যাতন ঃ

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! তাহলে তো দেখছি যারা আরাকানের ময়দানে জিহাদ করছে তারাও জিহাদে দিফায়ী করছে।

ঃ তাতো দিবালোকের মত স্পষ্ট। কেননা, এ আরাকানও এক সময় মুসলিম শাসিত ছিল। ১৪৩০ সালে এখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৭৮৪ সালে স্বৈরাচারী বর্মী বৌদ্ধ রাজা কুখ্যাত বোদাপায়া এ মুসলিম রাজ্যকে আক্রমণ করে দখল করে নেয়। তখন থেকে অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে আরাকানের পবিত্র মাটি মুসলিম রক্তে রঞ্জিত করা হচ্ছে। হত্যা, ধর্ষন, লুণ্ঠন, বিতাড়ন, উচ্ছেদ, ছিনতাই, সহায়সম্পদ জবরদখল, লুটতরাজ, রাহাজানী আজ আরাকানের নিত্যদিনের ঘটনা।

ফতুয়ার ধরণ ঃ

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! অনেকে বলে আরাকানে এখনো জিহাদের প্রয়োজন নেই। বরং তথায় যারা যুদ্ধ করছে তারা প্রকৃত মুজাহিদ নয়; সন্ত্রাসী। আরাকানের মানুষ সুখেই আছে। যারা এমন কথা বলে তাদের মধ্য হতে অনেকে আলেম এবং মুফতী সাবান ও রয়েছেন। এবং তারা

এক আরাকানীর সাক্ষাতকার নিয়েই একথা বলেছেন। এক্ষেত্রে আমি কার কথা বিশ্বাস করবো?

ঃ দেখ মুশকিল ভাই! কোন আলেম বা মুফতীর কথার উপর কথা বলার সাহস বা যোগ্যতা আমার আদৌ নেই। তবে একটি বাস্তব ও সত্য চিত্র হলো এই যে, আমি এই সমাজে তিন ধরণের মুফতী পেয়েছি। এবং একটি মাসআলার তিন ধরণের সমাধান ঐ তিন ধরণের মুফতী সাহেবানদের কাছ থেকে পেয়েছি। এবার শুন তিন ধরণের ব্যাখ্যা-

এক ধরণের মুফতী সাহেবান রয়েছেন, যাঁরা দুনিয়ার হাল-হকিকত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বেখবর। একটি মাদ্রাসার চার দেয়াল তাঁদের রাজ্য। যখন তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, বর্তমান জিহাদের হুকুম কি? তখন তিনি তার রাজ্যের প্রতিটি প্রজার প্রতি নযর বুলিয়ে দেখেন: সবার মুখে দাঁড়ি, মাথায় সুন্নাতী চুল আর সুন্দর সুন্দর টুপী। তখন তিনি চিন্‌তা করেন জিহাদ হবে কাদের উপর। ওরাতো সবাই আল্লাহর ওলী তালেবে এল্‌ম। আর মাদ্রাসা বহির্ভূত দুনিয়া? সেতো অন্য জগৎ, তা নিয়ে মাথা ব্যথা কিসের? নিজে বাঁচলেই বাপের নাম। তখন তিনি ফতুয়া দেন- বর্তমান যুগে জিহাদ নেই। আরেক প্রকার মুফতীসাহেবগণ হলেন; যাঁরা পত্র-পত্রিকা পড়া হারামকে জলাঞ্জলী দিয়ে দু'চার বার পত্রিকায় নযর বুলিয়েছেন। দেশ বিদেশ সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা রাখেন; তাঁরা জিহাদকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফরযে কিফায়ার স্থানে রাখেন। আর তৃতীয় প্রকার মুফতী সাবান রয়েছেন। যাঁরা ইফতা কোর্স সমাপ্ত করে দু'চার দিন রণাঙ্গনে পা রেখে এসেছেন। মাঠ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা রয়েছে। যাঁরা শুধু নীচু মুখে না চলে সমাজের এদিক ওদিকের প্রেক্ষাপটেও নজর দিয়েছেন। তাদের কাছে গেলে শুনা যায় জিহাদ ফরযে আইন। তবে খুশীর কথা হল বর্তমান বিশ্বের শ্রদ্ধাভাজন আলেমগণ তৃতীয় প্রকার মুফতীদের সমর্থনে দিনদিন এগিয়ে আসছেন। এবার কার ফতুয়া গ্রহণযোগ্য এটা দেখতে হলে জানতে হবে; হুযুর সা. কোন ধরণের মুফতী ছিলেন। মাঠের মুফতী নাকি ঘরণী মুফতী? তিনি

যদি মাঠের মুফতী হয়ে থাকেন তাহলে এ নব্য আবু জাহেলদের যুগে হুযুরের সা. সঠিক উত্তরাধিকারী মুফতীর ফতুয়া নিয়েই পথ বেছে নিতে হবে।

আর আরাকান সম্পর্কে তুমি যে কথা শুনেছো, "তারা সুখেই আছে"। তাহল এক সৌদী প্রবাসী আরাকানীর সাক্ষাতকার। তিনি অনেককাল যাবৎ সৌদী থাকেন। মাঝে মধ্যে দেশের বাড়ী এলেও তার জ্ঞাতি ভাইদের খবর নিতে সময় পান না। কেননা তিনি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। যদি আরাকানীরা নির্যাতিত না হতো তা হলে চট্টগ্রামের উদ্বাস্তু শিবিরের শরনার্থী রোহিঙ্গারা কি কক্সবাজারে হাওয়া খেতে এসেছিল? হাঁ তারা বাংলাদেশ সরকারের মুড়ি চিড়ার সাথে বঙ্গোপসাগরের হাওয়া খাচ্ছেন ঠিকই, তবে সে হাওয়ার পিছনে রয়েছে ধাঁওয়া। আরাকানী সীমান্তরক্ষী নাসাক্কারা মুসলমানদের তাড়িয়ে বলছে, "তোরা আরাকানে বিদেশী নাগরিক, তোরা চট্টলার (চট্টগ্রামের) মানুষ, সেখায় চলে যা।" খবরে আসছে সেই ধাওয়া খেয়ে ১৯৯১ ও '৯২ সালে সীমান্ত পেরিয়ে আড়াই লাখের উপরে মুসলমান রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। '৯৬ সালের খবর হল তারা প্রায় দুই লাখ পনর হাজার দেশে ফিরে গেছে, আর সীমান্তের চারটি শিবিরে প্রায় ১৪ হাজার উদ্বাস্তু দেশে ফিরে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে। এনির্যাতন আরাকানে নতুন নয়। সেই '৪৮ সাল থেকে আরাকানকে মুসলিম মুক্ত করণ কল্পে এ পর্যন্ত ১৪টি শুধু সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। আর অর্থনৈতিক নির্যাতন তো রয়েছেই। কিন্তু তবুও তারা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান উৎক্ষাত করতে না পেরে; পরিশেষে মায়ানমার সরকার ১৯৯৬ সালে মুসলিম নিধনে পটুদাদা 'ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ' কে আরাকানে নিযুক্ত করে। তাদের দেয়া বিদ্যাবুদ্ধিতে গদগদ মায়ানমার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ মুসলিম নিধনের অভিনব ফরমূলা উদ্ভাবন করেছে। যার মূলনীতি হলো বার্মিজ ছন্দে-

ম্নে মিউ মাংলু মিউ সপ্রু

লু মিউ মাংলু মিউ প্রুভ ॥

যার অর্থ হল- জমীনে মানুষ গিলে ফেললে ও মানুষ শেষ হবে না যদিনা মানুষ মানুষকে গিলে ফেলে। এতেই মানুষ শেষ হয়ে যাবে।' এ পলিসির আওতায় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দু'টি পন্থা অবলম্বন করেছে। এক- শারীরিক নির্যাতন, দুই- কৃত্রিমভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে সামাজিক নির্যাতন। যার চিত্র তুলে ধরতে গেলে বেশ সময়ের প্রয়োজন। এদিকে তুমিনা বলে ছিলে জিহাদের প্রকার ভেদ সম্পর্কে একটি বিশেষ ইশকাল রয়েছে, সেটার জবাব ও তো দিতে হবে।

ঃ না, না! ঐ ইশকাল পরে করা যাবে। আগে আরাকানের নির্যাতনের চিত্রগুলি তুলে ধরুন। আমার আরাকানী ভাইদের কলিজায় যে আগুন জ্বলছে তার স্ফুলিংগ যদি আমাদের এখানেও এসে পড়ে; আর আসাটাই তো স্বাভাবিক। আগুন যদি লাগে, আর যদি তা নিভানো না হয় তাহলে তো নির্বোধ ও একথা মানতে রাজি যে, পাশের ঘরটাও পুড়ে ছাই হবে।

ঃ আরে এ দেখছি সুন্দর কথা বলতে শিখে গেছ। তোমার কথা খুবই যুক্তি যুক্ত। ইতিহাস পড়লেও তাই জানতে যে, তাতারী হামলা একদিনেই বাগদাদের উপর আসেনি। আসছে ধীরে ধীরে। এসেছে খারেজম, মরভ, বলখ, হিরাত, গজনী, মুলতান, শাহপুর আর সিন্ধু নদ পেরিয়ে। অথচ বাগদাদ বাসীরা যদি প্রথমেই খারেজম মুসলিম সেনাপতি তৈমুরের সাথে হাত মিলাতো তাহলে তাতারী নেতা চেঙ্গিস খান খারেজমের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারতো না। কিন্তু বাগদাদের খলীফা ব্যক্তিগত সাধারণ বিরোধের কারণে গোটাজাতির জন্য একাজ করতে পারল না। বরং চেঙ্গিসকে আরো লেলিয়ে দিল। ফলে কি দাঁড়াল? দাঁড়াল তাই; যে গোটা দুনিয়া চষে বেড়িয়ে হত্যা, লুটতরাজ করতে করতে শেষে বাগদাদকেও রক্ষা করলো না চেঙ্গিসের পান্ডারা। বরং চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর তারই পূত্র হালাকু খান তার বাপের কথা "গ্রহ লোকে সূর্য একটি সুতরাং গৃহলোকেও বাদশাহ্ হবে একজন।" কথাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বাগদাদে চড়াও হলো। এবং দজলার পানিকে রক্তে রঙ্গিন করে দিল। কুতুব খানা, মাদ্রাসা, বাড়িঘর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা সহস্র জিহ্বা আকাশের

দিকে মেলে দিল। যার ধোঁয়ায় বাগদাদের সুখের আকাশ আঁধারে ভরে গেল। বছরের পর বছর ধরে যে সরকারী আলেমরা সংগ্রামপ্রিয় আলেমদের কাফির ফতুয়া দিতে পটু ছিল। এক্ষেত্রেও তারা সবাই দরবারী হওয়ার লালসায় বহু দাসী, তোহফা নিয়ে হাজির হলেন হালাকু খানের খিদমতে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষি, জিন্দা কেহ ফিরে আসতে পারেনি। বাগদাদের বাসীন্দারা প্রথমে যেই বীজ বপন করেছিল; তারই ফল তারা পেয়ে বসলো।

এই যা, দেখোতো কোন কথা বলতে গিয়ে কোন ইতিহাস নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি। তুমি শুনতে চেয়েছিলে আরাকানের কাহিনী। আসলে এ কাহিনী তেমন সুখের কাহিনী নয়; তাই বলতেও ইচ্ছে করে না। তবুও বলতে হয়। শুন! শারীরিক নির্যাতনের কাহিনী আর কি বলবো। '৯৬ইং এর রমজান মাসে ছিলাম চাটগায়ের একটি এলাকায়। সেখানে সাক্ষাত হলো '৯৩ সালে হিজরত কারী আরাকানী ভাই হাসানের সাথে। সে আরাকানের স্থানীয় একটি মুজাহিদ সংস্থা আর, এফ, ইউ এর সদস্য। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনারা কত ভাই বোন। বলল, তিন বোন আর ভাই বলতে আমি একা।

মা-বাবা আছে কি?

আছে।

দেশে কেন যাচ্ছেন না?

গিয়ে কি লাভ? কাজ করে যদি ফল না খেতে পারি, তার চেয়ে দূরে বসে না খেয়ে মরাই ভাল। বললাম তার মানে?

বললো! নাসাক্কা বাহিনী প্রতিদিন মুসলমান যুবকদের ধরে নিয়ে সারাদিন পাহাড়ে কাজ করায়। পারিশ্রমিক চাইলে গুলি; নয়তো পাহাড়ের চুড়া হতে গড়িয়ে পড়া ভাগ্যে জুটে। বললাম মা-বোন আছে তো, তাদের দেখতে যান না?

এবার হাসান ভাইয়ের চেহারায় বিষন্নতা ফুটে উঠলো। কিন্তু চোখে পানি এল সামান্ন যা গড়াতে পারেনি। মনে হল বহু দুঃখে পানি আটকা পড়ে আছে। অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, গেলেই যে মরতে হবে। কেন যাবেন আর চলে আসবেন। বলল, তাব্বে ধরিয়ে দিবে। বললাম, তাব্বে কি?

পাশের বন্ধু বুঝিয়ে দিল। গুপ্তচরকে ওদের ভাষায় তাব্বে বলে। প্রশ্ন করতে চাইলাম আপনার মা-বোনদের অবস্থা কি ভাল মনে হয়? কিন্তু করলাম না। জানি ওখানে তার মা আর যুবতী বোনেরা ইজ্জতের সাথে নেই। কেননা তার আগের দিন রাত্রে ভাই আতিকুর রহমানের কাছে একটি ঘটনা শুনে আরাকানী মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমরা চারজন মুজাহিদ একরাতে এক মুসলমান বস্তিতে গেলাম, এক বাড়িতে গিয়ে দেখলাম পুরুষ বলতে কোন লোক নেই, সব কাজের ভয়ে পালিয়েছে। ঘরের মহিলা ভীতুস্বরে বলল, আপনারা পাশের ঘরে যান। আমি বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে ঠান্ডা করে আসি। আমরা বললাম, পাশের ঘরে যাব কেন? মহিলা বলল, দয়া করে বাচ্চাদের সামনে আমাকে........। বুঝতে পারলাম; ওরা আমাদের বর্মী মনে করেছে। তাই বললাম, আমরা মুজাহিদ। মহিলা এবার কেঁদে বললো, আপনারা এসেছেন কেন আমাদের ঘরে? যদি তারা টের পেয়ে যায়, আগামীকাল জীবিত রাখবেনা আমাকে। ওরা আপনাদের গুপ্তচর মনে করে আমাকে মেরে ফেলবে। বুঝতে পারলাম; প্রত্যহ ওদের ঘরে নাসাক্কারা আসা যাওয়া করে আর বাড়িতে পুরুষ শুন্য মহিলাদের যেমন খুশি ব্যবহার করে। আর ওরা সেই পাশবিক অত্যাচারকে সয়ে নিয়েছে। না সয়েই আর যাবে কোথায়; বাঁচতে যখন হবেই। এতো বললাম নিজের ও সাথী বন্ধুর অভিগ্যতা থেকে। আরো যে কত চিত্র আমাদের অগোচরে পড়ে আছে। তার হিসেব রাখে কে?

এই তো তাজা খবর ১৯৯৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী আর ১২ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। ৬ই ফেব্রুয়ারীতে বাহার ছড়া গ্রামের মংডু শহরের

জনৈক মাওলানাকে ৮নং নাসাক্কা ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার হেয়ালী করে ধরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় এবং মাওলানার জীবনের যবনিকাপাত ঘটায়। ১২ই ফেব্রুয়ারীতে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার ১৮নং ইউনিট ১৮ বছরের এক যুবক আমীর পিতা গোলাম কবিরকে ধরে নিয়ে যায়। আমীর হোসেন বুচিদং শহরের পশ্চিম ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সে এরই একমাস পূর্বে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। সে বাংলাদেশের মহোচনী শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে ধরার পর এম. আই এর প্রধান এর প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং কাওয়ার বিলে নাসাক্কার হেড কোয়াটারে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়। বার বার তাকে প্রশ্ন করা হয়, সে দেশদ্রোহী কোন রোহিঙ্গা সংগঠনের সাথে জড়িত কিনা? পরবর্তীতে নাসাক্কা তাকে পার্শবর্তী জঙ্গলে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এমনি হাজারো কাহিনী রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। দৃষ্টিতে যে কয়টি ধরা পড়েছে তার মধ্য হতে আরেকটি মাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। তা হলো মাওলানা জিয়াউল হাকীম বর্মীর দেয়া সাক্ষাতকার। মাওলানা এখন কোথায় আছেন জানিনা। তবে তিনি ১৯৯৫ আরাকানী নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে বাংলাদেশে হিজরত করেন। তার দেয়া সাক্ষাতকার দেশের শীর্ষ স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। আমি তোমাকে তোমার উপকারার্থে 'জাগে মুজাহিদ' ১৯৯৫ এপ্রিল সংখ্যার বরাত দিয়ে শুনাচ্ছি; অধৈর্য হবে না তো?

ঃ না, না! অধৈর্যের কি আছে? আমার তো বেশ ভালই লাগছে। তবে ভাই মুজাহিদ! আমাকে এখন আর মুশকিল সাব বলবেন না। কারণ আমি নিজেকে এখন ইশকাল মুক্ত মনে করছি।

ঃ আচ্ছা তবে আপনাকে কি বলবো?

ঃ আমাকে ও আপনার সাথী মুজাহিদ মনে করতে পারেন।

ঃ না, এখনো তোমাকে পূর্ণরূপে ইশকাল মুক্ত করতে পারিনি। কেননা, তুমি বলেছিলে জিহাদের প্রকারভেদ সম্পর্কে তোমার এক বিশেষ ইশকাল

রয়েছে। ওটা খণ্ডাতে হবে। তারপর দেখা যাবে আবার শর্ত নিয়ে ইশকাল শুরু করছো। ঐ সব ইশকাল দূর করে তবেই তোমাকে আমার সঙ্গী মুজাাহিদ বলবো। তবে এক্ষেত্রে তোমাকে একটা নতুন নাম দিতে পারি।

ঃ আচ্ছা! কি সে নাম?

ঃ তা হলো রাকিবুল জিহাদ।

ঃ মুশকিলের তো একটা অর্থ ছিল; ইশকালকারী। এর অর্থটা কি?

ঃ রাকীব অর্থ যাত্রী আর রাকীবুল জিহাদের অর্থ জিহাদের পথে যাত্রী। তোমার ইশকালের উপর জিহাদে যাত্রা করার ইচ্ছাটা বিজয়ী হয়েছে বলেই ঐ নামটা দিলাম। আর যেহেতু পুরোপুরি যাত্রা কর নাই তাই মুজাহিদ বলা হতে বিরত রলাম। তবে আশা করি অচিরেই তুমি মুজাহিদ খেতাব টা পেয়ে যাবে।

ঃ তা আপনি খেতাব যখনই দেন না কেন, আমি নিজেকে এক্ষুণি মুজাহিদ মনে করছি।

ঃ তা করতে পার আপত্তি নেই।

ঃ যাই হোক এবার ভাই, ঐ মাওলানা জিয়াউল হাকীম বর্মী সাহেবের সাক্ষাতকারটা বলুন না।

ঃ হাঁ, বলছি শুন। তার শুনানো মর্মান্তিক কাহিনী হলো-

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল। কুমিরখালী এলাকায় আমরা সেনা ক্যাম্প হতে এক হুকুম নামা পাই। তাতে লেখা ছিল- প্রত্যেক গ্রাম হতে দশজন অবিবাহিত যুবতীকে নিয়ে তাদের পিতারা যেন কুমীর খালী ক্যাম্পে হাজির হয়। হুকুম নামার সাথে প্রত্যেক গ্রামের ১০জন মেয়ের একটি লিস্টও প্রেরণ করা হয়, যা ছিল প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের মেয়েদের তালিকা। শেষে লেখা ছিল- এসব মেয়েদের নিয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ৬ মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে ক্যাম্পের বাইরে

এমনকি আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করতে দেয়া হবে না। অবশেষে হুমকী দেয়া হয় যদি কোন পিতা তাদের মেয়েকে নিয়ে হাজির না হয় তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এছিল আরাকানের আলেমদের মানসিক ভাবে নির্যাতন ও তাদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানার পূর্ব পরিকল্পিত নীল নক্সা। ইতিপুর্বে ও প্রায়ই সেনারা গ্রাম হতে মেয়েদের ধরে নিয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ দানের নামে তাদের লাইগেশন করে যৌন নির্যাতন চালাতো। এ ছিল গ্রামের প্রতিকৃত বিষয়। তবে তারা ভীত হয়ে যেত এ কারণে যে, সরকার যা বলে তা করে ছাড়ে। ২৬শে ডিসেম্বর ফজর ওয়াক্তে সেনারা গ্রামে প্রবেশ করে মসজিদে নামাযরত মুসল্লীদের মাঝে মেয়েদের লিষ্ট বিতরণ করে তাদের নিজ নিজ মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হতে বলে। আমরা কয়েকজন মেয়ে না নিয়েই ক্যাম্পে হাজির হই। অফিসার তাতে রেগে ফেটে পড়ে মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করে। উত্তরে জানাই, আমাদের শরীয়তে মেয়েদের একাকী কোথা ও রাখা নিষেধ আছে। পরে আমাদেরকে ঝিমুরখালী ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সেখানে ও অফিসার বাবুরা সাথে মেয়েদের না দেখে রাগে লাল হয়ে এর কারণ জানতে প্রশ্ন তুলে। আমরা তাকেও একই উত্তর দেই। আবার জিজ্ঞেস করে কোথায় তোমাদের এই আইন লেখা আছে। উত্তর দেই, আমাদের পবিত্র কোরআনের ১৮পারায়। উত্তর শুনে ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং অধীনস্ত সেনাদের দিয়ে আমাদের পরনের কাপড় চোপড় খুলে নেয়। এরপর সেনা ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী নোংরা ও আবর্জনাময় জায়গা পরিস্কারে বাধ্য করে। সাথে ছিলেন মাওলানা সিরাজুল হক নামের শতোর্ধ বয়সের একজন প্রবিন আলেম। তিনি ভয়ে তাসবিহ্ পড়ছিলেন। সৈন্যরা তার তাসবিহ্ কেড়ে নিয়ে কাজে বাধ্য করলো। জোহরের নামাযের সময় নামাযের আবেদন করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হলো। বেলা দু'টার সময় আমাদের ঐ অবস্থায় উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে পাঠানো হয়। সেখানে আলেমদের এক লাইনে আর সাধারণদের এক লাইনে বসানো হয়। অফিসার মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করায় আমরা শরীয়তের কথা বলতেই সে গর্জে উঠে এবং বলে, তোমাদের শুধু শরীয়ত নয়, সরকারী আইন ও

মানতে হবে। উত্তরে বলি, স্যার সরকারী আইন যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়; মানতে রাজি আছি কিন্তু তা না হলে আমরা মানবো কিভাবে?

অফিসার বলে, অন্যান্য মুসলিম দেশে মেয়েরা পর্দা মানেনা। তারা একা রাস্তায় বের হয়। তারা পারলে তোমরা পারবে না কেন? বললাম, স্যার! আপনাদের ধর্মেতো চুরি, খুন, জ্বেনা মহাপাপ। অথচ আপনাদের সমাজের অনেকেই তা মানছে না। তাই বলে কি আপনাদের সবাই ধর্মকে অস্বীকার করে। ধর্ম বিরোধী কাজকে পছন্দ করে? উত্তর না দিতে পেরে নারী লোভী অফিসার থ মেরে যায়। কিন্তু দাম্ভিক কি শুনে যুক্তির কথা? আমাকে সে গাছের সাথে বাঁধিয়ে সৈন্যদের দ্বারা বেত্রাঘাত করে। আর বলে, "তোমার আল্লাহ তোমায় মারছে।"

আমি মুখ বুজে সব সহ্য করি আর মনে মনে যিকির করতে থাকি। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে এক রুমে নিয়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে যা দেখলাম, তা ছিল আমার কল্পনাতীত। সে দৃশ্য অবলোকনে আমার গা শিহরিয়ে ওঠে। দেখি সামনে রাখা কাটা দাঁড়ির স্তুপ। এ দাঁড়ি আরাকানের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকজন আলেমের। যাদের মধ্যে রয়েছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আরাকানী তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা নবী হোসেন। বার্মার মুফতীয়ে আযম মাওলানা সুলতান আহমদ সাব, মাওলানা জাফর আলী সাব। তারা লজ্জায় মাথা নীচু করে আছে। আখেরে আমার সাথেও হল ঐ আচরণ।

হায়েনার দল জোর করে আমাদের সযত্নে লালিত সুন্নতী দাঁড়ি মুণ্ডে দিল। অপমানে মাথায় আগুন ধরে গেল। কিন্তু হায়! আমি যে অসহায়। পরে উপস্থিত ১০টি গ্রামের নির্ধারিত ১০০ মেয়ের পিতাকে আমাদের অবস্থা দেখিয়ে সাবধান করে দেয়া হয়। বলা হয় যদি কেউ সরকারী আইন মানতে অস্বীকার করে তবে তাদের শাস্তি হবে এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমাদেরকে পরের দিন দশটার মধ্যে মেয়ে নিয়ে হাজির হওয়ার শর্তে ছেড়ে দেয়া হয়। আমি বাড়ি ফিরে রাতেই পরিবার পরিজন নিয়েই বাংলাদেশে হিজরত করি। এ ঘটনা আরাকানের হাজারো

নির্যাতনের ক্ষুদ্র একটি চিত্র মাত্র। প্রতিদিন এ ধরণের অসংখ্য নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেই চলছে। কথা হলো, আর কতকাল আমরা এভাবে নির্যাতিত হব? বিশ্ববাসী কি আমাদের এ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে না। তাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? প্রতিবেশী বাংলাদেশী ভাইদের প্রতিও আমার জিজ্ঞাসা! মুসলমান হিসেবে এ জুলুম নিরসনে আমাদের পাশে দাঁড়ানো কি আপনাদের দায়িত্ব নয়?

ভাই রাকীবুল জিহাদ! এবার আমার প্রশ্ন তোমার কাছে। কোরআনের আয়াত "ওমা-লাকুম লা তুক্বাতিলুনা ফী সাবিলিল্লাহি ওয়াল মুসতাদআফিনা মিনার রিজালি ওয়ান্নিসায়ী.......।" অর্থঃ কি হলো তোমাদের যে তোমরা যুদ্ধ করছো না আল্লাহর রাহে? ঐ সমস্ত নরনারী আর শিশুদের পক্ষে। যারা ফরিয়াদ করছে প্রভূ হে! আমাদের এ জনপদ হতে অন্যত্র নিয়ে যাও। এখানকার অধিপতিরা হলো জালিম। অন্যথায় আমাদের তরে পাঠাও তোমার পক্ষ হতে সাহায্যকারী ও অভিভাবক।" এই আয়াত আল্লাহ কাদের জন্য পেশ করেছেন? কাদের ধমকি দিচ্ছেন যে, তোমাদের কি হলো যে নিপীড়িত মানুষের জন্য যুদ্ধ করছো না।

ঃ আরে! এতো সোজার চাইতে সোজা কথা যে, এই আয়াতের মিছদাক (লক্ষ্য) আমরাই। কেননা, আমাদের পাশেই আরাকানী মা-বোন, ভাই-বন্ধুরা প্রত্যহ আল্লাহর কাছে মুক্তির জন্য দোয়া ও সাহায্যের দোয়া করছে। এ মুহূর্তে আল্লাহর চিরন্তন আয়াতের ধমকী তো আমাদেরই উপরে পড়ে।

মুজাহিদ ভাই! মনে কিছু করবেন না। এতক্ষণ আরাকানীদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার সিংহ ভাগই দৈহিক নির্যাতন। যদি সামাজিক কিছু নির্যাতনের কথা বলতেন। তাহলে হয়তো তাদের অবস্থা আরো সুন্দর ফুটে উঠতো।

সামাজিক নির্যাতন ঃ

আমি আশা করেছিলাম তুমি এবার প্রকারভেদের সেই ইশকালটি করে বসবে। ঠিক আছে তা পরে হলে ও চলবে। এবার তোমাকে আরাকানের সামাজিক চিত্রে নিয়ে যাচ্ছি। গোটা সমাজকে আমি তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করে বর্ণনা করছি। এক- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, দুই- অর্থনৈতিক শোষন, তিন- ধর্মীয় ক্ষেত্রে আঘাত।

রাজনৈতিক অঙ্গন ঃ "ছাইড়াদে মা কাইন্দা মরি" অবস্থা যে মুসলমানদের; তারা করবে আবার রাজনীতি। বর্মী সরকারতো মুসলমানদের বরাবরই চট্টলার মানুষ বলে আখ্যা দিয়েছে। তাইতো দেখা যায় নে-উইনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত রোহিঙ্গা মুসলমানরা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আজ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে কোন দল গঠন বা প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। আর চাকরী-বাকরী? সেতো আকাশের চাঁদ। মুসলমানরা যেখানে বামুনের মত জীবন যাপন করছে। সেখানে চাঁদ ছোঁয়া হাস্যকর বৈ কিছুই নয়। কখনো এদেরকে প্রতিরক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ করা হয় না এবং বিভিন্ন সার্ভিসের ক্ষেত্রে ও বৈষম্যতার অন্ত নেই।

ইমিগ্রেশন আইনের ক্ষেত্রেও এরা অবৈধ প্রবাসী। তাই সদাই এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অপারেশন চালানো হয়। ১৯৮২ সালে নাগরিক আইন, যা নে-উইন পার্লামেন্টে গৃহিত হয়, তাতে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রবিহীন লোক (State Less) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও আরাকানী মুসলমানেরা নিজ দেশের ভিতরে ও অবাধে স্বাধীন ভাবে চলতে পারে না। যা মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী। এমনকি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলেও পারমিট প্রয়োজন। আর এ পারমিট নিতে হয় স্থানীয় মোড়ল বা সেনা প্রধানের কাছ থেকে। এছাড়াও যেসব মুসলমানদের আগে সাদা ন্যাশনালিটি কার্ড (ভাসমান জাতির মান সম্পন্ন কার্ড) দেয়া হয়েছিল তাও এখন বাজেয়াপ্ত করা

হচ্ছে। আরাকানী মুসলমারা তাদের মূল ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানেও যাওয়ার অধিকার পায় না। এর জন্য জলে স্থলে আকাশ পথে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। আরাকান থেকে দেশের রাজধানী রেঙ্গুন যাওয়ার একমাত্র বিমান বন্দর আকিয়াবে অবস্থিত। বিমানের ভাড়া মাত্র ৫২৫ খিয়াট; কিন্তু কোন মুসলমানকে বিমানের টিকিট পেতে হলে রাখাইনদের ধর্মমন্দিরে পূঁজার চাঁদা বাবদ এক থেকে দেড় লাখ খিয়াট পরিশোধ করতে হয়। এ চাঁদার রশিদ দেখালে পরেই বিমানের টিকিট মিলে। জল ও স্থল পথের তারা এক ঘরোয়া হয়ে আছে। রাজনৈতিক বৈষম্যতা আর কাকে বলে।

অর্থনৈতিক শোষণ ঃ নির্যাতনের আরেক সিস্টেম অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করা। মুসলমানদের জমিজমাগুলি সেখানে কাল্পনিক ভাবেই বাজেয়াপ্ত করা হয়। মুসলমানদের চিংড়ি চাষের প্রকল্পগুলো কারণ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। এছাড়াও সরকারী কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের নিকট হতে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য জোরপূর্বক সীজ করে নেয়। যারা সরকারী দাবী অনুযায়ী দিতে পারে না, তাদের জমি রাষ্ট্র কর্তৃক দখল হয়ে যায়। তারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে না। ছোট বা ক্ষুদ্র দোকানগুলোকে প্রায়ই লুট করা হয়।

মুসলমানদেরকে প্রায়ই সৈন্য ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে চাল, ডাল, মুরগী, ছাগল, কাঠ এবং নির্মান সামগ্রী সরবরাহ করতে বাধ্য থাকতে হয়। এভাবেই অর্থনৈতিক শোষণে ভিটে ছাড়া হয়ে অসংখ্য রোহিঙ্গারা হিজরত করতে বাধ্য হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে আঘাত ঃ মুসলমানগণ নসীহত ও তাবলীগের জন্য এক জায়গা হতে আরেক জায়গা যেতে পারে না। আরাকানের তাবলীগ মারকাজ মসজিদ আজ তালাবদ্ধ। ধর্মীয় কাজে ওয়াক্‌ফকৃত জমি ও কবরস্থান এখন বাজেয়াপ্ত করে অমুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়।

যেখানে আজ বিধর্মীদের মার্কেট ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। সৈন্যরা প্রায়ই মসজিদে জুতা পায়ে প্রবেশ করে এবং সেখানে মদ পান করে। তারা মসজিদ কম্পাউন্ডে থুথু, পেশাব-পায়খানা দ্বারা ভরে ফেলে এবং অস্থায়ী ক্যাম্পের মত তাকে ব্যবহার করে।

বিগত ১৯৯৭ সালের ঈদুল আযহার ঘটনা- কুরবানীর আগের দিন বলে দেয়া হয় এদেশে বসবাস করতে হলে শুধু আল্লাহর আইন মানা চলবে না। সরকারের আইন-আদেশও মানতে হবে। সরকারের আদেশ অনুযায়ী তোমরা ১৮ই এপ্রিলের পরিবর্তে ২১শে এপ্রিল কুরবানী করবে এবং তা সেনাপতির তত্ত্বাবধানে মায়ানমার সরকারের নামে দিতে হবে। মুসলমানরা এ প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হতে অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে, ঈদের নামায ও কুরবানী করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

খবরের কাগজে উল্লেখ, এ বছরেই আরাকানের কর্তৃপক্ষ পুরোনো শহর মুরকওয়ো (যা বর্তমান মারুহাঙ্গ নামে পরিচিত) শহরে একটি ঐতিহাসিক মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার আদেশ জারী করেছে। মসজিদটি 'সানদিখান মসজিদ' নামে পরিচিত। যেটি ৬০০ বছরের পুরোনো এবং মুসলিম রাজার শাসন কালে নির্মিত হয়েছিল। বার্মার সামরিকজান্তা নির্লজ্জভাবে দাবী করে আসছে যে, আরাকানের ইতিহাসে কোন মুসলিম শাসক ছিল না। আর এ কথাকে সত্যায়িত করার জন্য ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলো ধ্বংসের পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়, বিশেষভাবে মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত নিদর্শনগুলো। উল্লেখ্য যে, বর্মী সামরিক জান্তা মনে করে যে, পর্যটকরা আরাকানে মুসলমানদের প্রভাবের কোন চিহ্ন না দেখাই শ্রেয়। এ উদ্দেশ্যে সানদিখান মসজিদ পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়।

বার্মায় নিয়োজিত কূটনৈতিক সূত্রের মতে রেঙ্গুনে ২২শে মার্চ ৫টি মসজিদ ধ্বংস করে এবং শত শত কুরআন রাজপথে অগ্নিদগ্ধ করে। স্লক সংগঠনের সদস্যরা গোপনে সন্নাসী বেশে ১৫ই মার্চ ১৯৯৭ এ দুটি বিখ্যাত মসজিদে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেয় আর অপর ২১টি মসজিদ

ধ্বংস করে ফেলে। হায়রে আমার ধর্মীয় স্বাধীনতা!

ইসলাম কি অন্য ধর্মের প্রতি এমন আঘাত হেনেছে কোন দিন? তারাও তো এ জমীনে আটশত বছর রাজত্ব করেছে। রাকীবুল জিহাদ! তোমার হয়তো এতক্ষনে তন্দ্রায় পেয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল। এখানে দীর্ঘ হলেও; বাস্তবতার দিক থেকে কিন্তু অতি সংক্ষেপ তাই না?

ঃ হাঁ, হাঁ, অবশ্যি সংক্ষেপ হয়েছে। আমি কিন্তু অস্থির হইনি।

ঃ তা হলে এবার শুনুন এক মজলুম আরাকানীর চিঠির সংলাপ। আরাকান হতে ভাই ডাক্তার বশির আহমদ শরনার্থীদের হাতে বাঙ্গালীদের তরে লিখে পাঠিয়েছেন-

আরাকানের মা-বোনদের উপর নির্যাতনের অন্ত নেই। বরং বেড়েই চলেছে দিন দিন। আমি দূর থেকে বলছি বলে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। প্রয়োজনে এসে দেখে যেতে পারেন, এমন অবিশ্বাস আর কতদিন করবেন। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আমরা কি আপনাদের মুসলিম ভাই নই দয়া করে আমাদের থেকে গাফেল হবেন না। হয়তো অতিশীঘ্রই আপনাদেরও এ নির্যাতন পোহাতে হবে। আমাদের নির্যাতনের কাহিনী শুনলে আপনাদের শরীর শিউরে উঠবে। তবুও না বলে পারছি না। শুধু আশা, আমার এ কথা গুলো আমার নবীর বাঙ্গালী উম্মতের কাছে পৌঁছে দিবেন। আমাদের নির্যাতন বসনিয়া, কাশ্মির অপেক্ষা কম নয়। শুধু প্রচারই কম হচ্ছে এই যা। আশা করি পত্রখানা বাংলাদেশের মুসলমানদের হাতে হাতে প্রচার করবেন।

১৯৮০ সালে বুছং এলাকায় তবলীগী বড় ইজতেমার মাঠ বর্মী সরকার জবর দখল করে এয়ারপোর্ট তৈরী করেছে এবং তা সৈনিকদের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। মুসলমানদের আমদানী পণ্য কব্জা করা হচ্ছে। গরু-ছাগলের মত করে ব্যবহার করা হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে। সৈনিকেরা মসজিদগুলোকে আড্ডাখানায় পরিনত করে মিনারায় চড়ে পশ্চিম দিকে ফিরে প্রস্রাব করছে, পায়খানা করছে। ১৯৮৬ সালের মে

মাসে মংডু শহরে পবিত্র শবে কদরে বর্মী সেনারা নিরীহ মুসলমানদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। ফায়ারিং করে ২৫টি তাজা প্রাণকে শহীদ করে দেয়। ধ্বংস করে ফেলে ১০টি মাদ্রাসা।

১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসের ২১-২২ তারিখে ১০হাজার মুসলমানকে বন্দী করে এবং এলাকার যুবতী মা-বোনদের হাইজাক করে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের কয়েকটি ঘটনা- ৩রা মার্চ বর্মীসেনাদের আক্রমনে ১০০ জন প্রাণ হারায়। ৪ঠা মার্চ ১৭ জন মুসলমানকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ১০০ মা-বোনকে ধর্ষনের পর শহীদ করা হয়। ১২ই মার্চ ১০০ মুসলমানকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ২০শে মার্চ নামায রত মুসলমানদের উপর ফায়ার করে ৩০০০ মুসলমানকে পরপারে পাঠানো হয়। আহত হয় ৫০০ জন। ফায়ার চালানো হয় পবিত্র ঈদের জামাতের উপর।

৭৮৮ সাল পূর্ব হতে বসবাসরত মুসলমানদের আপন দেশ হতে উৎখাতের জন্যই এই হীন পরিকল্পনা। কথাগুলো হয়তো বিশ্বাস হবে না। বার্মা সরকারের উদ্দেশ্য একমাত্র সমূলে মুসলমানদের উৎখাত এবং আলেম সমাজের অবমূল্যায়ন।

আজ মসজিদগুলোকে মন্দিরে পরিনত করা হচ্ছে। মাদ্রাসা গুলোকে অস্থায়ী ক্যাম্প বানানো হচ্ছে। কবরস্থানকে মার্কেটে পরিনত করা হচ্ছে। হয়তো শুনে আশ্চার্যান্বিত হবেন। বর্মী মুসলমানরা দ্বীনের কথা শুনে আত্মাকে তাজা করার জন্য যেই মসজিদে জমা হতো। সেই তাবলীগ মারকাজ মসজিদটিতে আজ তালা ঝুলছে।

আপনাদের কি কোন অনুভূতি নেই? এ নির্যাতন আর জুলুমের কাহিনী শুনেও কি ঘরের কোনে বসে থাকবেন? অথচ আমরা অসহায়! মাজলুম! সবার মুখে ঐ একই আর্তনাদ প্রভূ! আমাদের তরে সাহায্যকারী পাঠাও। আপনারা আমাদের কাছের ভাই। বহিরাগত সাহায্য ছাড়া বর্মী মুসলমানদের পক্ষে মুকাবেলা দুষ্কর। তাই আমি আরাকান থেকে বলছি,

আপনাদের মুসলমান মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হে আল্লাহ তুমি উমরকে পুনরায় জীবিত করো। পাঠাও সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে আবার দুনিয়ায়।

ইতি

ডাক্তার বশির আহমদ
খন্দকার পাড়া, মন্ডু,
আকিয়াব, আরাকান।

জিহাদের ছোট-বড় সাইজ ঃ

ঃ হয়েছে, হয়েছে, বেশ হয়েছে। মুজাহিদ ভাই! যার বদনে বিন্দু রক্ত আছে। মাথায় বিবেক বলতে কিছু আছে; তার জন্য আরাকানীদের দুরাবস্থা বুঝতে এতোটুকুই যথেষ্ট নয় বরং বেশী। এবার আমার বিশেষ ইশকালটি পেশ করি।

ঃ আচ্ছা কর, কি সে ইশকাল?

ঃ ইশকালটি হল বহু পরিচিত মশহুর ইশকাল। তা হল ছোট জিহাদ আর বড় জিহাদের ইশকাল। আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! রুই মাছ থাকতে টেংরা বাবুর কি প্রয়োজন? আমরা যদি বড় জিহাদ করি, ছোট জিহাদের প্রয়োজন কিসের?

ঃ আচ্ছা মুশকিল ভাই! না, না, রাকীব ভাই! আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুনতো ছোট জিহাদ কোনটি আর বড় জিহাদ কোনটি?

ঃ কেন, অস্ত্রের জিহাদ হলো ছোট জিহাদ আর নফসের জিহাদ হলো বড় জিহাদ। যে কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

ঃ আচ্ছা তার কোন দলীল তুমি দিতে পারবে কি?

ঃ অবশ্যি, আল্লাহর রাসূল তাবুক যুদ্ধ হতে ফিরতি পথে বলেছিলেন, "রজা'না মিনাল জিহাদিল আসগারি ইলা জিহাদিল আকবার।"

ঃ আচ্ছা, এখানে কি কোন নফস শব্দ আছে?

ঃ না নেই।

ঃ তবে কি করে বললে যে এই হাদীস দ্বারা বড় জিহাদ বলতে নফ্সের জিহাদকে বুঝানো হয়েছে?

ঃ হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন তাই।

ঃ অনেক হাদীস ব্যাখ্যাতাগণতো এটাও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই ছোট জিহাদ মানে 'তাবুব যুদ্ধ' যা নাসারাদের বিরুদ্ধে হয়েছে। আর বড় জিহাদ দ্বারা হুযুর নাসারাদের সাথেই বড় ধরণের আক্রমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যা খলীফা উমরের রা. যুগে ইন্তাকিয়া শাম ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদাস বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এটাই হওয়া যুক্তি যুক্ত। কেননা এসব যুদ্ধ ঐ নাছারা গোষ্ঠীর সাথে হয়েছে, যাদের সাথে তাবুক যুদ্ধ হয়েছিল। আর প্রথম ব্যাখ্যা নিলেও তোমাকে আমি বাধা দিতে পারিনা। তবে সে ব্যাখ্যায় একটা খারাবী আবশ্যক হয়ে যায়।

ঃ কি সেই খারাবীটা?

ঃ তা হলো আগে সাহাবীরা যে জিহাদ করেছিলেন তাতে নফ্সের জিহাদ ছিল না। সবে মাত্র তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। অথচ নফসকে পবিত্র করার সর্বোৎকৃষ্ট সবুজ ক্ষেত্র হলো জিহাদের ময়দান। আর সাহাবারা সকলে তরবারীর জিহাদের সাথে সাথেই রণাঙ্গনেই নফসের সাথে জিহাদ করেছেন। আর শুন রাকীব! তুমি কি বলতে পারবে উক্ত হাদীসটিকে কে বর্ণনা করেছেন?

ঃ না আমি শুধু শুনেছি।

ঃ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা শেষে তিনি নিজেই বলেছেন, এ হাদীসের সনদে ত্রুটি রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের মতে এটা 'মওযূ' বলে প্রমাণিত। যা দলীল হতে পারে না অথচ আজকাল অনেক বিজ্ঞ লোকেও সনদ ও উদ্ধৃতি ব্যতীত এ হাদীসটি উল্লেখ করে জিহাদের বিপক্ষে একটি রাস্তা খোলার অপচেষ্টা চালায়। আমাদের বক্তব্য হলো, এ হাদীসটি পূর্ণ বিশুদ্ধ হলেও এর দ্বারা জিহাদ হতে বিরত থাকা আবশ্যক হয় না। কেননা সাহাবারাতো আর এ হাদীস শুনে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। তবে আমরা কেন যুদ্ধ জিহাদকে এড়াতে এ হাদীস সামনে আনি?

ঃ আচ্ছা মুজাহিদ ভাই! তাহলে কোরআনের আয়াত তো আর ফেলে দেয়া যায় না।

ঃ কেন কোরআনে কি আছে?

ঃ কুরআনে বলা হয়েছে "ওয়াজাহিদ হুম বিহি জিহাদান কাবীরা" অর্থ- তোমরা এর মাধ্যমে জিহাদ কর, বড় জিহাদ। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। যখন পরিভাষার জিহাদ বলতে কিছু ছিল না।

ঃ আচ্ছা, এখানে এর মাধ্যমে মানে কার মাধ্যমে?

ঃ কেন কোরআন বা ফুরকানের মাধ্যমে।

ঃ তাহলে তো দেখা যাচ্ছে কুরআনের জিহাদ বড় জিহাদ; নফস পেলে কোথায়?

ঃ মানে এই কুরআনের দ্বারাই নফ্সের সাথে জিহাদ করতে বলা হয়েছে।

ঃ আসলে পূর্ণ আয়াতের অর্থ হলো, "তোমরা কাফিরদের অনুসরণ করো না এবং তাদের সাথে (কাফিরদের সাথে) এর মাধ্যমে (কুরআনের) কঠোর সংগ্রাম কর।" বুঝতেই পারছো কুরআনের দ্বারা মানে কুরআনের আয়াত দলীল প্রমাণাদী দ্বারা কাফিরদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। তাফসীরে মাআ'রেফুল কুরআনের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, এ আয়াতের

অর্থ হলো, তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমে হোক, কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক সবগুলোই বড় জিহাদ। হাঁ, তবে যদিও নফ্সের প্রতি জিহাদ করার অর্থ নেয়া হয় (কাফিরদের নফ্স) তথাপিও শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। কেননা আভিধানিক অর্থ কখনো পারিভাষিক অর্থে প্রভাব ফেলে না। যেমন, কুরআনে আছে, "ইন্নাল্লাহা ওয়ামালাইকাতাহু ইউসাল্লূনা আলা'ন্নাবিয়্যি। অর্থঃ আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর সা. প্রতি দরুদ পড়ে।" এখানে 'সালাতুন' শব্দের শাব্দিক অর্থ দরুদই প্রযোজ্য পরিভাষার নামায কস্মিনকালেও হতে পারে না। পারবেনা। আর মক্কায় যেহেতু পরিভাষার জিহাদ ছিল না তাই বুঝতে হবে এই জিহাদের শাব্দিক অর্থই এখানে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আভিধানিক জিহাদ যতোই বড় হোক না কেন, সে এক হুকুম। আর পরিভাষার জিহাদের অন্য হুকুম। তাইতো দেখা যায় কেহ কলম দিয়ে বা মুখ দিয়ে হাজারো জিহাদ করলেও তাকে মুজাহিদ বলা হয় না। কেহ বললেও মৃত্যুর পরে তাকে শহীদ বলে না। তারপর জোর করে কেহ বললেও তাকে তারাই শহীদের মর্যাদা দেন না। কেননা প্রকৃত শহীদকে গোসল দেয়া শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন কলামিস্ট বা বক্তাকে লিখতে বা বকতে বকতে মারা গেলে গোসল ছাড়াই দাফন করা হয় না। আর কুরআনেও তো বলা হয়েছে, "তোমরা তাদেরে মৃত্যু বলো না যারা আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়েছে বরং তারা জীবিত" আল্লাহ এখানে 'মান উকতালু' অর্থ যারা নিহত হয়েছে বলেছেন, আর জীবনতো কতো ভাবেই দেয়া যায়। হাঁ, তবে যারা কতল সংক্রান্ত কোন বিভাগে কাজ করতে করতে মারা যায় যেমন, মুজাহিদদের অস্ত্র ইত্যাদি বানানোর বিভাগে কাজ করতে করতে মারা গেল তবে সেও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। শর্ত হলো তাকে জিহাদের কমান্ডারের অধিনস্ত হতে হবে। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, জিহাদ বড় হোক আর ছোট হোক একটা আরেকটার প্রতিবন্ধক নয়।

ঃ তা বুঝেছি, তবে নফ্‌সের প্রতি কি কোন জিহাদের প্রয়োজন নেই?

ঃ অবশ্যি আছে। আত্মশুদ্ধি না হলে কোন ব্যক্তিই জিহাদে কামিয়াব হতে পারবেনা। পাবে না সে শাহাদাতের মর্যাদা। হয়তো জীবন দিয়েও তাকে যেতে হবে জাহান্নামে। তবে নফ্‌সকে বিশুদ্ধ করণের সর্বোত্তম স্থান জিহাদের ময়দান। মসজিদে নববীতে স্বয়ং মুহাম্মদ সা. এর পিছনে নামায আদায়কারীর মনেও অনেক কিছু লুপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু তরবারীর নীচে মাথা রাখতে গেলেই ইবনে সুলুলের গোষ্ঠী পিঠ মোড়া দেয়া শুরু করে। তুমি জানো কিনা জানিনা, নফ্‌সের মধ্যে পার্থিব স্বার্থ কেবল জিহাদেই থাকেনা; নামায, হজ্জ, যাকাত, দানের ক্ষেত্রেও থাকে। তাই বলে কেউ নামায, যাকাত বাদ দিতে বলে না যে, আগে নফ্‌সকে ঠিক করে নাও, তারপর নামায পড়। কেননা নামায পড়তে পড়তেই হয়তো কেউ জান্নাতী হয়। না হয় ঐ নামাযই তাকে জাহান্নামে পাঠায়।

ঃ আচ্ছা এতো বুঝলাম নফ্‌সের জিহাদ রণাঙ্গনেও চলে। বরং আরো ভালোভাবে চলে। তবে ঈমানের ব্যাপারটায় কি বলবেন। হুযুর সা. তো তের বছর ঈমানের মেহনত করে তার পর জিহাদে নেমেছেন।

ঃ জিহাদ করতে হলে আল্লাহ রাসূলে ঈমান আনা পূর্বশর্ত তবে তার পিছনে তের বছর মেহনত শর্ত নয়।

ঃ তবে হুযুর সা. যে করেছেন?

ঃ তিনি তের বছরের মধ্যে জিহাদ করেননি একটি শক্তি অর্জনের অপেক্ষায়। যদিও ইসলামের বিজয় পার্থিব শক্তি আর জনবলের উপর ভিত্তি করে নয়। তথাপিও লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়নে ওয়ালার একটা গ্রুপ থাকার প্রয়োজন ছিল। যখন সে গ্রুপ প্রস্তুত হয়ে গেল। অমনি জিহাদ শুরু হয়ে গেল। যা চলবে দাজ্জাল কতলের আগ পর্যন্ত। আর তুমি যদি বল- তের বছর ঈমানের মেহনত জিহাদের পূর্বশর্ত; তাহলে ঐ সমস্ত সাহাবাদের ব্যাপারে তোমার রায় কি যাঁরা জিহাদের ময়দানে ঈমান এনে ঐ জিহাদেই শাহাদাত বরণ করেছেন এবং হুযুর সা. তাদের জান্নাতী

বলেছেন।

ঐ সমস্ত সাহাবাদের ব্যাপারে কি বলবে? যাঁরা মাদানী জিন্দেগীতে মুসলমান হয়ে তের বছর না পুরতেই বদর, উহুদ, খন্দকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আসলে এসবই গা বাঁচানো কথা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এবার আসো তোমাকে মুজাহিদ করে নেই। আশা করি এপথে চলতে যতটুকু ইশকাল মুক্ত হওয়া চাই ততোটুকু হয়েছ।

ঃ আরে বলেন কি? আমিতো বহু পূর্বে মুজাহিদ বনে গেছি, এখন যা ইশকাল করেছি এলেম চর্চার তাগিদেই করেছি। আশাকরি বিরক্ত হবেন না।

ঃ অবশ্যই করতে পারবে। বিরক্ত হবো কেন? জানার জন্য ইশকাল করলে মজাই লাগে; তবে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় যখন কেহ শুধু তর্কের জন্য ইশকাল করে।

ইকদামী জিহাদের দলীল ঃ

ঃ আচ্ছা! পূর্বেই আপনি আলোচনা করেছেন জিহাদ দুই প্রকার। এক- ইকদামী (আক্রমণাত্মক যুদ্ধ), দুই- দিফায়ী (প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ) এবং বলেছেন উভয় প্রকারই ফরয। একটা ফরযে আইন, অপরটি কিফায়াহ্। এবার আমার প্রশ্ন, ইকদামী জিহাদ বলতে কিছুই নেই তবে তার হুকুম কি?

ঃ তার হুকুম হলো সে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করলো। কেননা, কুরআনের দ্বারা দিফায়ীর ন্যায় ইকদামীরও অনুমতি রয়েছে। বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করুক।" আরো বলা হয়েছে, "নিধন কর মুশরিকদের, যেথায় পাও।" আরো বলা হয়েছে, "তোমরা ফিতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং মতবাদ একমাত্র আল্লাহর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ কর।" কেননা জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হকের প্রসার যা

ইকদামী জিহাদ দ্বারা হয়। তাই ইকদামী জিহাদ কেবল জায়েযই নয় বরং উত্তম। আর এই কুরআনের আয়াত এড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তির সম্পর্কে আমি কি বলবো, কুরআন হাদীসইতো তাদের লক্ষ্য করে বহুকিছু বলেছে।

আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখতে পাই যে, বহু জায়গায় এই ইকদামী জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীনের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। সেই যে মক্কা বিজয়ের পর থেকে যতো দেশ মুসলমানরা জয় করেছে; তার অধিকাংশই এই জিহাদের দ্বারা হয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, কুতাইবা বিন মুসলিম, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, সুলতান মাহমুদ গজনবী সকলেই দিফায়ীর সাথে সাথে ইকদামী জিহাদও করেছেন। অতদূর দেখার কি আছে? স্বয়ং হুযুরের জীবনীতেই দৃষ্টি ফেলুন, দেখবেন হুযুর সা. যেই ২৭টি যুদ্ধে কমান্ডার ইন চীফের দায়িত্ব পালন করেছেন, তার মধ্য হতে ঐতিহাসিক বদরের জিহাদ প্রথমতঃ ইকদামী জিহাদই ছিল যদিও পরবর্তীতে তা দিফায়ীর রূপ ধারণ করে। এছাড়াও তাবুকের যুদ্ধ এবং বদর পূর্ব আবওয়ার যুদ্ধ ও বুয়াতের যুদ্ধ ইকদামী বৈ অন্য কিছুই ছিল না।

প্রভূর বাণী, "অতএব তোমরা যুদ্ধকর শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।"

ঃ মুজাহিদ ভাই! যারা বলে ইসলামে যুদ্ধ বলতে কিছু নেই। তাদের অবস্থা কি?

ঃ কুরআনের একটি নির্দিষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করলে যদি কাফির হতে পারে তাহলে কিতাল বা স্বশস্ত্র যুদ্ধ যার সম্পর্কে রয়েছে ৬৮১টি আয়াত; তা অস্বীকারকারীকে কি বলতে হবে, তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার শব্দ ভাণ্ডারে নেই।

জিহাদের পূর্বশর্তের শর্ত ঃ

ঃ এবার আসুন জিহাদের শর্তাবলী নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

ঃ নির্দিধায় বলতে পার কোন আপত্তি নেই, কারণ তুমি এখন মুশকিল সাব নও।

ঃ আচ্ছা জিহাদের জন্য কোন পূর্ব শর্ত আছে কি?

ঃ অবশ্যই আছে।

ঃ তা কি কি?

ঃ প্রথমে ঈমান আনতে হবে, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানবান পুরুষ ইমামের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে, তৃতীয়তঃ দারুল আমান থাকতে হবে।

ঃ আচ্ছা এই শর্তের জন্য আবার কোন শর্ত আছে কি-না?

ঃ আলহামদুলিল্লাহ্॥

ঃ তার মানে? আলহামদুলিল্লাহ বললেন কেন?

ঃ আলহামদুলিল্লাহ বলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেইনি। বরং তোমার প্রশ্ন করায় শুকরিয়া আদায় করছি।

ঃ কেন শুকরিয়ার কি আছে? আমি তো মনে করেছি এই অযথা প্রশ্নে আপনি চটে যাবেন।

ঃ এটা অযথা প্রশ্ন নয়। এটাই এ দুঃসময়ের শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। অনেকে শুধু শর্তারোপ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু কখন কোন শর্ত কার্যকর তা ভেবে দেখেনা। এই ধরো, প্রথম শর্ত ঈমান আনা, এট্যাতো এমন শর্ত যা না থাকলে কোন আমলই কাজে আসবে না। আর দ্বিতীয় শর্ত খলীফার পক্ষ হতে ইমাম নিযুক্ত হওয়া, যার জন্য একটি সীমারেখা রয়েছে। ফতুয়ায়ে শামীর পাতাটা একটু অলসতাকে কুরবানী দিয়ে খুললেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিহাদ যখন নফীরে আম হয়। অর্থাৎ যখন খবর

হয়ে যায় কোন মুসলিম জনপদে শত্রু আক্রমণ করতে এসে গেছে বা মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে এবং মুসলিম নারীদের সতীত্ব হরণ করছে আর ছোট ছোট শিশুদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে। তখন এই ইমামের প্রয়োজন হয়না। খলীফা কর্তৃক ইমাম বা আমীর নিযুক্তকরণ শর্ত ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; যখন কোথাও ইসলামী স্টেট প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারা পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তখন খলীফা কর্তৃক আমীর নিযুক্ত হতে হবে। এবং যে দেশে আক্রমণ করতে চাচ্ছে আমীর সেথায় এই মর্মে দাওয়াত প্রেরণ করবে, হয় ইসলাম গ্রহণ করুন নয় জিযিয়া দানে সম্মত হউন। আর এই দুইয়ের বিকল্পে তরবারীর খাপ খুলতে হবে। যেমনটি করেছিলেন খিলাফতে রাশেদার যুগে মুসলিম সেনাপতিরা। ইরান, তুরান, মিশর তো এই নিয়মেই জয় করেছিলেন খালিদ, সা'দ, আমর রাদিআল্লাহু আনহুমগণ।

এবার তৃতীয় শর্ত দারুল আমান। এক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা। মুজাহিদদের জন্য দারুল আমান একটি সহায়স্থল। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের সময় তথা হতে সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন, নবী সা.এর যুগে মুজাহিদদের দারুল আমান ছিল মদীনা। আফগান রণাঙ্গনের জানবাজ মুজাহিদদের দারুল আমান ছিল পাকিস্তান। অতএব দারুল আমানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলে দারুল আমান না থাকলে জিহাদ ফরজ হবে না, অমুসলিমদের অত্যাচার-অবিচার নিরবে মেনে নিতে হবে, তাগুতি শক্তির আক্রমণেও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না তুলে শুধুমাত্র হাতপা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে আর মার খেয়ে যেতে হবে এমন গাঁজাখুরী বিধান পবিত্র ইসলামে নেই। বরং জিহাদে দিফায়ী যখন নফীরে আমের ভিত্তিতে ফরয হবে তখন এর প্রয়োজন হবে না। এ ব্যাপারে আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। এক্ষেত্রে সবার মত এক ও অভিন্ন। এবার তোমাকে একটু ইতিহাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। বিরক্ত হবে না কিন্তু, শুন! শাহ্ আব্দুল আযীয

মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ. কর্তৃক যখন ভারত বর্ষ দারুল হরব ঘোষণা হলো, তখন মুসলিম জাতির অন্তরে জিহাদী চেতনা পুনরায় উজ্জীবিত হলো। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য মাওলানা সাইয়েদ আহমদ বেরলবী রহ.এর নেতৃত্বে এবং তার জামাতা মাওলানা আব্দুল হাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. এর সেনাপতিত্বে ১৮১৭ সালে বিশাল মুজাহিদ বাহিনী গঠিত হয়ে অত্যাচারী ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে স্বশস্ত্র জিহাদ শুরু করে দেন। ঐ সময় মুজাহিদগণের জন্য কোন দারুল আমান ছিলনা। সমগ্র ভারত বর্ষ তখন ইংরেজদের দখলেই ছিল। কোন আলিম, মুফতী বা মুহাদ্দিস সে সময় দারুল আমানের প্রশ্ন তুলেননি। বরং ইংরেজদের পদলেহনে ধন্য কতেক দালাল কিসিমের আলেম নামধারী বিদআতী ছাড়া উপমহাদেশের সকল হক্কানী ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মুফতী, মুহাদ্দিস ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে, উপমহাদেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিম নানুতবী রহ.ও ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শামেলীর যুদ্ধের একজন বীর সিহপাহ্সালার। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদ্রাসার কারিকুলাম অনুযায়ী লেখাপড়া করে আলিম হয়ে দিফায়ী জিহাদের ক্ষেত্রে দারুল আমানের প্রশ্ন তোলা সত্যি দুঃখজনক। ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে একথ বলা যায় যে, দিফায়ী জিহাদের জন্য দারুল আমানের প্রয়োজন হয় না।

ঃ আরে মুজাহিদ ভাই! ঐ যে একটা কথা রয়ে গেল না? যদি মুসলিম রাজা-বাদশাহ্ জনগণকে জিহাদের হুকুম দেয় তখন জিহাদ ফরয হয়ে যায়। চাই তখন জিহাদের আমীর ফাসিকই হোক না কেন?

ঃ আরে, একটি কেন? কতো কথাই না রয়ে গেছে। সব কথা কিআর আমাদের ইশকালে এসেছে? তবে ওটাও আসতো যদি আমাদের হাতে ইসলামী রাষ্ট্র থাকতো এবং সরকার হতো মুসলিম।

ঃ তাহলে আমাদের সরকার কি মুসলিম নয়?

ঃ হাঁ মুসলিম। তবে জন্মসূত্রে; কার্যক্ষেত্রে নয়। এবার আমরা আমাদের আলোচনাকে শেষ করতে পারি কেমন?

ঃ হাঁ, তবে আর দু'টি মাত্র ইশকাল। একটি হলো, যদি কেহ বলে জিহাদের লক্ষ্য হলো কালিমা বুলন্দ করা। এখন যদি জিহাদ ছাড়া অন্য পন্থায় তা করি তাহলে জিহাদ নামে মারামারির প্রয়োজন কিসের?

আরেকটি প্রশ্ন হলো; তাবলীগ আগে নাকি জিহাদ আগে?

ঃ এর উত্তর অতি সোজা। তবে কঠিন হলো বুঝা। যদি কোন যাকের ভাই বলেন, "নামাযের উদ্দেশ্য হলো খোদার যিকির, কেননা কুরআনে আছে, "আকিমিস্ সালাতা লিযিকরী" মানে নামায কায়েম করো আমার যিকিরের জন্য। এখানে নামাযটা কারণ হলো যিকিরের, সুতরাং আমরা সরাসরি যিকিরই করবো। নামাযের কি প্রয়োজন?" এক্ষেত্রে মুফতীগণ ঐ যাকের ভাইকে কি বলবেন? কাফির না মুসলমান?

যদি মুফতীগণ তাকে কাফির, ভণ্ড ইত্যাদি বলতে পারেন, তাহলে তাঁরা জিহাদের অসংখ্য আয়াত থাকতে তা অস্বীকারকারীকে কি বলবেন, তা আমারা জান্না নেই।

আগে তাবলীগ পরে জিহাদ ঃ

এবার আসো দ্বিতীয় প্রশ্নে, তাবলীগ আগে নাকি জিহাদ আগে? একথা চিরন্তন যে, তাবলীগ ছাড়া দুনিয়ার বুকে কোন প্রোগ্রামই সফল হয়নি। কেননা প্রচারেই প্রসার। আর প্রসারতা বয়ে আনে সফলতা। আজ বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে মুজাহিদদের যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, এর পিছনেও রয়েছে দাওয়াতের অবদান। তবে তা ছয় উসুলের হতে পারে নয় উসুলেরও হতে পারে। এবার একটি গল্পশুনো। পোটল গাঁয়ের মোড়ল সাব। কনের বিবাহ দিবে মহা ধুমধামে। বিবাহের দিন তারিখ সব ঠিকঠাক। কালক্রমে এসে গেল সেই দিন। মোড়ল বাড়ির সিংহদ্বারে সাজানো হয়েছে আধুনিক সরঞ্জামাদির সব কিছু দিয়ে বিবাহ গেইট।

তাতে শোভা পাচ্ছে লাল নীল ঝাঁড় বাতি। খাবারের ঘরে চেয়ার-টেবিলের সমারোহ। রাঁধুনীরা পোলাও-কোর্মা, মুরগীর রোস্ট, ঝাল-মাংশ রেঁধে সেরে গোসল করে এসেছে। মেহমান আসবে দু'টার সময়। এই আশায় মোড়লবাড়ির সবাই অপেক্ষমান। মোড়ল সাব অন্দর মহলে বসে বরের ও মেহমানদের আগমন সম্পর্কে বারংবার খবর নিচ্ছেন। আর না আসার খবর শুনে শুনে অস্থির হচ্ছেন। দু'টো পেরিয়ে তিনটে তারপর আসর হলো। আসর পেরিয়ে মাগরিবের সময় ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় মোড়ল সাব ঘর হতে বেরিয়ে মাথায় হাত রেখে উঠানে বসে পড়লেন। দাসী-বাদী স্ত্রীরা ছুটে এলো। বেহুস॥ কেহ মাথায় পানি ঢালছে। কেহ দিচ্ছে পায়ে তেল। বাড়িতে চাকর-বাকর, দাসী-বাঁদী, স্ত্রী-পুত্র একটা পুঁই পোনাও নেই। মোড়ল বাড়ির বিয়ে অথচ এমন জনশুন্য। সত্যি অপমানের কথা। বরের মেহমান নয় না-ই এলো। নিজেদের নাইওর ঝিঁয়েরাতো আসবে। আহারে স্বাদের কোর্মা পোলাও! সবই বুঝি যাবে জলে। এবার বড় বৌ সোয়ামীকে সাহস করে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা আপনি কি দাওয়াত দিয়েছিলেন আত্মীয়দেরকে? এবার মোড়ল ক্ষেপে বললেন, বাজার-ঘাট করে সময় পাইনা, আবার দাওয়াত। মোড়ল সাব সাজসরঞ্জামাদি সব করেছেন। কিন্তু হবু আত্মীয় পুরানা আত্মীয় কাউকেই দাওয়াত করেন নি। ফলে, সবই গেল জলে।

এতো গেল সেবারের কথা। এবার শুনো পরের কথা। প্রথম বারে কন্যা বিয়ে দিতে গিয়ে শিক্ষা হল মোড়ল সাবের। বিয়ে দিল ভেঙ্গে। তারিখ হলো পর বছরের চৈত্র মাসে। এবার মোড়ল সাব দাওয়াত দানে এতোই মশগুল যে বাকী সব ভুলে গেছেন। এমনকি চৈত্র মাস এসে হাজির। বিয়ের দিন মোড়ল বাড়ি সরগরম অবস্থা।

দাওয়াত পেয়ে এবার নাতির ঘরের পুতিটাও এসে হাজির। কিন্তু কনেকে এখনো সাজানো হয়নি। সাজানো হয়নি গেইট, খাবার ঘর ইত্যাদি। এসে গেছে বর। এসেছে তার সাথে সম্মানিত মেহমানরাও। কিন্তু বসবে কোথায় তারা। প্রথম দিনেইতো আর শাশুড়ীর কোলে চলে

যেতে পারে না। কেহ বসলো গাছ তলায় খড়কুটো বিছিয়ে, কেহ বসল পুকুর পাড়ের সিঁড়িতে, কেহ গেল নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে। কিন্তু বরের বাপ চটে গেলেন। তিনি অন্দর মহলের দিক ছুটে চললেন মোড়ল বিয়াইকে ডাঁটিবার তরে। দেখলেন বিয়াই মোড়ল সাব জুতো হাতে, ছাতা বোগলে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন। অমনি লম্বা একটা সালাম ছুড়ে মারলেন বরের বাপ। মোড়ল সাব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আরে বিয়াই সাব। এসে গেছেন? বসুন, বসুন।

বরের বাপ কোন মতে রাগটা সামলে নিয়ে বললেন, "কোথায় যাচ্ছেন, বলদেরকে বসিয়ে রেখে খাশি কিনতে যাচ্ছেন বুঝি? মোড়ল সাব বললেন, না, না, বিয়াই সাব! ঐ আমার বড় মেয়েকে এখনো দারয়াত দিতে পারিনি; তাকে দাওয়াত দিতে যাচ্ছি।

বরের বাপ হা হয়ে গেলেন। কি বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ভাবলেন অপমান একবারই ভালা, এবার পালা। কিন্তু পালাবেন কি করে। মানুষ যে অনেক। এতো মানুষকে কি করে বুঝাবেন। কনে বন্ধা, এ বিয়ে হবে না। বুঝানো যেত যদি সত্যি সত্যি কনে বন্ধা হত। এখানে তো কনে বন্ধা নয়। বন্ধা; কনের বাবার মাথার স্ক্রু। তাই সবে মোড়লের বাড়ি পানি পান করে পাশের বাড়ি চলে যায়। পাশের বাড়ির লেলিন হেগেল আব্রাহামেরা মোড়ল বাড়ির এন্টি গ্রুপ। পানির অপর নাম জীবন। তবে তার আপ্যায়নে কনে বিয়ে দেয়া যায় না। এন্টি গ্রুপেরা কৌশলে পোলও কোর্মা খাইয়ে আপন মন্ত্রে রচিত কৃত্রিম কন্যাকে ফুলিয়ে ফাঁসিয়ে মেহমানদের হাতে তুলে দিল। ফলে মোগড়লের চৈত্র মাস তারা নিল আর সর্বনাস এসে মোড়লবাড়ি ঘিরে নিলো।

তাইতো বলি, ওহে ভাই মৌলবী সাব! আসরের ওযু করতে করতে মাগরীবের ওয়াক্ত পার করে সফলতার স্বপ্ন দেখোনা।

আল্লাহ মুহসীন

ছোটদের
জিহাদ শিক্ষা

মূল

কমান্ডার মাওঃ মাসউদ আযহার

অনুবাদ

মুহাঃ ইয়াকুব আলী তৌহীদ

প্রকাশনা

রহিমিয়া লাইব্রেরী

ঢাকা

হে তরুণ!

তারুণ্য কোথায়?

তোদের বিহনে

কেনরে আজিকে

ইসলাম প্রদীপ

যায় নিভে যায়॥

-অনুবাদক

উৎসর্গ

ঐ দুই স্বর্ণ কিশোরের নামে, যারা ঈমানের মর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হয়ে ও রাসুল প্রেমের সা. দাবী পূরণে কৈশরেই তারুণ্যের উন্নত সাহসীকতার পরাকাষ্ঠা তৈরী করে এ উম্মতের নব্য ফিরাউন আবু জাহেলকে খুন রাঙা ধুলোয় ছিটকে মেরেছেন।

ইতিহাসের ঐ দুই আলোচিত কিশোর হযরত মা'আজ ও মুয়াওয়াজ রা.। যাঁদের ইতিহাস বুকে ধারণ করে আজো মুসলিম জাতি গর্ব করতে পারে।

- মাসউদ আযহার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রশ্ন-১ ঃ জিহাদের অর্থ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ও নিপিড়িত মুসলিম জাতির সংরক্ষনের তাগিদে যথাযথ চেষ্টা ব্যয়ে কাফির গোষ্ঠীর সাথে সম্মুখ ময়দানে যুদ্ধের পোশাকে লড়াই করা, বা মুজাহিদীনের সমস্ত প্রয়োজনাদির আঞ্জাম দানে আপন সর্বস্বকে বিলিয়ে দেয়া। চাই এ যুদ্ধ ঐ কাফিরদের সাথে হোক, যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে অথচ তারা তা গ্রহণ করেনি, কিংবা ঐ কাফিরদের সাথে হোক যারা মুসলমানদের উপর হামলাকারী হিসেবে সাব্যস্ত। (আমীরের তত্ত্বাবধানে কাফিরদের মোকাবেলায় যুদ্ধের যে কোন বিভাগে কাজ করলেই তা জিহাদ বলে বিবেচিত হবে।)

প্রশ্ন-২ ঃ জিহাদের নির্দেশ কবে কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ জিহাদের নির্দেশ সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরীতে পবিত্র শহর মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন-৩ ঃ সর্বপ্রথম জিহাদ সম্পর্কে কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ জিহাদ সম্পর্কে সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ সূরা হজ্জের ৩৯ নম্বর আয়তটি হলো- "উজিনা লিল্লাজিনা ইউক্বাতিলুনা বিআন্নাহুম যুলিমু, ওয়া ইন্নাল্লাহা আ'লা নাছরিহিম লাক্বাদীর।"

অর্থ- যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।

প্রশ্ন-৪ ঃ গাযওয়াহ কোন যুদ্ধকে বলা হয়?

উত্তর ঃ যে যুদ্ধে প্রিয় নবী সা. স্বশরীরে অংশ নিয়েছেন ঐ সকল যুদ্ধকে গাযওয়াহ বলা হয়।

প্রশ্ন-৫ ঃ সারইয়াহ্ কোন যুদ্ধকে বলা হয়?

উত্তর ঃ প্রিয় নবী সা. আপন জীবনে জিহাদের যে সব বাহিনী প্রস্তুত করে অভিযানে পাঠিয়েছেন, কিন্তু নিজে তাতে অংশ গ্রহণ করেননি। ঐ সকল যুদ্ধকে সারইয়াহ্ বলা হয়।

প্রশ্ন-৬ ঃ গাযওয়ার মোট সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ যে সকল যুদ্ধে স্বয়ং হুযুর সা. উপস্থিত থেকে কমান্ডিং করেছেন, তার সংখ্যা মোট ২৭টি বলে বহুল প্রচারিত। তবে কোন কোন বর্ণনায় এর সংখ্যা কম বেশীও জানা যায়।

প্রশ্ন-৭ ঃ প্রিয় নবী সা. এর অধীনে মোট কতটি সারইয়াহ্ সংগঠিত হয়েছে?

উত্তর ঃ প্রিয় নবী সা. মোট ৫৬টি সারইয়াহ্‌কে স্বহস্তে অভিযানে পাঠিয়েছেন। এর সংখ্যা সম্পর্কেও ভিন্ন মত রয়েছে।

প্রশ্ন-৮ ঃ ইসলামে জিহাদের অবস্থান কি?

উত্তর ঃ জিহাদ একটি ইসলামী ফরিযাহ্ এবং একটি উৎকৃষ্ট মানের ইবাদত।

প্রশ্ন-৯ ঃ জিহাদের তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ মহা পরাক্রমশালী ও মহান প্রভূ আল্লাহ পাক তাঁর স্বীয় বাণীগ্রন্থ আল-কুরআনে জিহাদের যে রহস্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন; তা হলো- "যদি জিহাদ না থাকে তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে অরাজকতার বিস্তৃতি ঘটবে এবং উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংশ করে দেয়া হবে।" অর্থাৎ যখন জিহাদের মাধ্যমে জালিম ও ঔদ্ধত্য

প্রকাশকারীদেরকে নিঃশেষ করা না হবে; তখন গোটা পৃথিবী ফিৎনা নামের জলদৈত্যের মুখে ঢুকে যাবে ঔদ্ধত্যরা তখন মুসলমানদের উপাসনালয়গুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে আর মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দিবে।

পক্ষান্তরে এই জিহাদের মাধ্যমেই ফিৎনাকে দুরিভূত করা হয় এবং জমীনে সুষ্ঠুতা, নিরাপত্তা, ন্যায় ও সুবিচার সাধারণ হয়ে যায়। ফলে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর উন্নত ব্যবস্থাপনা এ ধরার বুকে বিজয়ী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-১০ ঃ আমাদের নবীর সা. পূর্ববর্তী নবী আ.গণও কি জিহাদ করেছেন?

উত্তর ঃ জ্বি- হ্যাঁ। আমাদের প্রিয় নবীর সা. পূর্ববর্তী কয়েকজন নবী আ. জিহাদের ময়দানে নেমেছেন এবং তাঁদের সাথে মিলে তৎকালীন আল্লাহওয়ালারাও পরিপূর্ণ রূপে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

প্রশ্ন-১১ ঃ তিনি কোন নবী! যিনি বাল্যকালেই এক জালিম শাহ্ কাফিরকে হত্যা করেছেন?

উত্তর ঃ তিনি হযরত দাউদ আ.। যিনি বাল্যকালেই অত্যাচারী কাফির বাদশাহ জালুতকে হত্যা করেছিলেন।

প্রশ্ন-১২ ঃ তিনি কোন নবী, যিনি আপন উম্মতকে যুদ্ধের প্রতি আহবান করলে তারা কর্তব্য কর্মে পিঠ দেখানোর ভূমিকা পালন করে?

উত্তর ঃ হযরত মূসা আ.। তিনি তাঁর উম্মতের কাছে জিহাদের ফরমান জারী করলে তারা বলে দেয়, " আপনি আর আপনার প্রভূ দু'জন মিলেই জিহাদ করুন। আমরাতো এখানে বসেই আছি।

প্রশ্ন-১৩ ঃ তিনি কোন নবী, যিনি এই কামনা করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে একশত সন্তান দান করবেন আর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথের দূরদর্শী অশ্বারোহী এবং মুজাহিদরূপে গড়ে তুলবেন?

উত্তর ঃ সে শুভাকাঙ্খী নবী হলেন হযরত সুলাইমান আ.।

প্রশ্ন-১৪ ঃ পবিত্র কুরআনের সে কোন আয়াত, যদ্বারা জিহাদের ফরযিয়্যত প্রমাণিত হয়?

উত্তর ঃ সেই পবিত্র আয়াতটি হলো- "কুতিবা আ'লাইকুমুল কিতালু ওয়াহুয়া কুরহুল্লাকুম।"

অর্থ- "তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে হতে পারে একটা বিষয় এমন যা তোমাদের পছন্দসই নয়, অথচ তা কল্যাণকর। আর এমনও হতে পারে যে, একটা বিষয় এমন যা তোমাদের পছন্দসই অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্ত্তত; আল্লাহই জানেন, তোমরা নয়।"

(এ আয়াতটি ২য় পারাস্থ সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াত)

প্রশ্ন-১৫ ঃ কিতালের অর্থ কি?

উত্তর ঃ কিতাল ইহা আল্লাহর পথে তার পবিত্র কালিমা ও দ্বীনের সুউচ্চ মর্যাদা রক্ষার্থে ও তা বৃদ্ধিকরণ কল্পে দুশমনের সাথে যুদ্ধ করাকে বলে।

প্রশ্ন-১৬ ঃ জিহাদ কি রহমত না ফাসাদ?

উত্তর ঃ জিহাদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে গোটা মানবতার তরে এক উৎকৃষ্ট মানের রহমত।

প্রশ্ন-১৭ ঃ জিহাদ মুসলমানদের জন্য কিভাবে রহমত হলো?

উত্তর ঃ জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ করে থাকে। এছাড়া তারা বড় ধরণের পুরস্কার লাভ করে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত জিহাদকারীদের সাথে এ সবের অঙ্গিকার করেছেন। এমনি ভাবে জিহাদের মাধ্যমেই জমীনে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয় এবং কাফিরদের থেকে গনিমতের মাল অর্জিত হয়, যদ্বারা মুসলমানরা তাদের আয়াসী জিন্দেগী থেকে মুক্তি পায় ও সুন্দরতম জীবনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। এবং এ জিহাদের মাধ্যমেই শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা সুপ্রসন্ন ভাগ্যবানদের ভাগ্যে জুটে যায়।

প্রশ্ন-১৮ ঃ জিহাদ কাফিরদের জন্য কিভাবে রহমত হয়?

উত্তর ঃ জিহাদ কাফিরদের জন্য রহমত হয় এভাবে, তারা এ জিহাদের কারণে অধিকতর সময়ে কুফরী থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের হাতে ঘা খেয়ে আপন কর্মকাণ্ড প্রত্যাহার করতঃ আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব বুঝে ফেলে এবং কোন কোন সময় তারা মুসলমানদের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে রহমতের বারি বর্ষনে সিক্ত হয়ে যায় এবং তাদের অন্তকোঠায় ইসলামের সুগভীর ভালবাসা জায়গা করে নেয়। এমনকি এক পর্যায়ে তারা মুসলমান হয়ে যায়। এমনি ভাবে জিহাদের কারণে কাফিরগোষ্ঠী কুফরীর নিপিড়নমূলক শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে ইসলামী হুকুমতের ন্যায় সুবিচারের গন্ডিভূক্ত হয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে কাল যাপন করতে থাকে। (এটা কি তাদের জন্য রহমত নয়?)

প্রশ্ন-১৯ ঃ জিহাদ পূর্বে কোন জিনিস প্রয়োজন?

উত্তর ঃ জিহাদ পূর্বে জিহাদী প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ অতীব গুরুত্বের দাবী রাখে। স্বয়ংআল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মুসলমানদেরকে জিহাদী

প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ জারী করেছেন।

প্রশ্ন-২০ ঃ জিহাদী প্রস্তুতির দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ জিহাদী প্রস্তুতির উদ্দেশ্য হাতিয়ার প্রস্তুত করা বা অস্ত্র তৈরী করা এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া। শারীরিক দিক দিয়েও জিহাদের জন্য শক্তি অর্জন করতঃ সুদৃঢ় ও অবিচল হওয়া। অতি গুরুত্বের সাথে যুদ্ধের কৌশলাদি ও অস্ত্র চালনার জ্ঞান আয়ত্ব করা। যুদ্ধের জন্য ঘোড়া পালা বা প্রত্যেক যুগে তার উপযোগী যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি এতো পরিমান জমা করা যে, কুফরী শক্তি তাতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এমন প্রভাবান্বিত যে তারা আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে (আক্রমণতো দূরে থাক) ষড়যন্ত্র করতেও সাহস না পায়।

প্রশ্ন-২১ ঃ জিহাদের প্রস্তুতিতেও কি সওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ জ্বি- হ্যাঁ, জিহাদের প্রস্তুতির উপরও আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের পক্ষ হতে বহু প্রতিদান পাওয়া যায়। এমনকি যদি কেহ জিহাদের নিয়তে একটি ঘোড়া পুষে, তবে সে ঘোড়া সবুজ মাঠে বিচরণকালেও তার মালিক প্রতিদান পেতে থাকবে। এবং ঐ ঘোড়ার মলমূত্রের ওযন বরাবর কিয়ামতের দিন মালিক প্রতিদান পাবে। (এটা হাদীসের কথা) এ নির্দেশ জিহাদী প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদে রাখা যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-২২ ঃ জিহাদী দাওয়াতের গুরুত্ব কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আপন প্রাণপ্রতিম নবী সা.কে নির্দেশ করেছেন, " আপনি নিজেও জিহাদ করুন এবং ঈমানদারগণকে এ কাজের প্রতি উৎসাহিত করুন। যেহেতু এ এক সুকঠিন কাজ। ওদিকে আবার শয়তান তার কুমন্ত্রণার মিশন চালিয়ে, নফস তার হরেক রকম ধোকার জাল বিস্তার করে মানুষকে এ মহৎ কাজ থেকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। সেহেতু জিহাদের দাওয়াত

অতি গুরুত্বের সাথে দেয়া চাই, যেন দাওয়াত দাতাও প্রাপ্ত সকলের মাঝে এ কাজের চেতনা ও উদ্দীপনা চির উজ্জীবিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৩ ঃ যে মুসলমান জিহাদ করতে করতে দুশমনের হাতে নিহত হয় তাকে কি বলে?

উত্তর ঃ শরীয়তের পরিভাষায় তাকে শহীদ বলে।

প্রশ্ন-২৪ ঃ শহীদের মর্যাদা কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত পবিত্র কুরআনে বলেন, "তোমরা আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিকে মৃত বলোনা; তাঁরা জীবিত। হাদীস শরীফে এসেছে- আল্লাহ তায়ালা শহীদানদেরকে ছয়টি পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। এক- প্রথম পর্যায়েই তাঁর ক্ষমা ঘোষনা করা হবে এবং তাঁকে তাঁর ঠিকানা জান্নাতকে দেখিয়ে দেয়া হবে। দুই- কবরের শাস্তি হতে মুক্ত রাখা হবে। তিন- কিয়ামতের ময়দানে বড় বিপদের কালে তাঁকে আপদমুক্ত রাখা হবে। চার- তাঁর মাথায় সম্মানসূচক এমন একটি মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে যার একটি ইয়াকুত পাথর পৃথিবী ও তার মাঝে রক্ষিত সকল বস্তু হতে দামী হবে। পাঁচ- ডাগর-ডাগর, টানা-টানা হরিণী নয়না বাহাত্তরটি অপরুপা হুরীর সাথে তার সাদী করিয়ে দেয়া হবে। ছয়- সত্তরজন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করা হবে।

প্রশ্ন-২৫ ঃ শাহাদাতের তামান্না বা আশা রাখা কেমন?

উত্তর ঃ প্রতিটি মুসলমানের জন্য শাহাদাতের তামান্না রাখা এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা চাই। আমাদের প্রিয় নবী সা. নিজে বারংবার এ আশা ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্ন-২৬ ঃ যে মুসলমান যুদ্ধ করল কিন্তু শহীদ হলোনা তাঁকে কি বলা হবে?

উত্তর ঃ শরীয়তের পরিভাষায় সাধারনতঃ তাকে গাযী বলা হয়। এমনিতে তো যুদ্ধরত সকল মুজাহিদকেই গাযী বলা হয় তবে ব্যাপক ভাবে এ শব্দটি ঐ লোকদের শানে বলা হয়- যাঁরা জিহাদের ময়দান হতে যুদ্ধ শেষে শহীদ না হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।

প্রশ্ন-২৭ ঃ ঐ সম্পদ, যা মুসলমানরা কাফিরদের থেকে পেয়ে থাকে তাকে কি বলে?

উত্তর ঃ উহাকে মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ মাল বলে।

প্রশ্ন-২৮ ঃ গনিমতের মাল কি রকম সম্পদ?

উত্তর ঃ গনিমতের মাল অতিপবিত্র ও হালাল সম্পদ। আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় নবী সা. এর জন্য এ মালকে পছন্দ করেছেন। মুহাম্মদ সা. পবিত্র মদীনাতে গনিমতের মাল ব্যবহার করেছেন এবং তিনি বলেছেন, মুসলমানদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে গনিমতের সম্পদ।

প্রশ্ন-২৯ ঃ মালে গনিমত এবং মালে ফাই এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ যদি দুশমনের সাথে লড়াইয়ের পর মাল হস্তগত হয় তবে উহাকে মালে গনিমত বলে। আর যদি যুদ্ধ ছাড়াই দুশমন মাল সোপর্দ করে দেয় তবে উহাকে বলা হয় মালে ফাই (যেমন- জিযিয়ার কর, ট্যাক্স ইত্যাদি)

প্রশ্ন-৩০ ঃ যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের কি রকম যুদ্ধ করা উচিত?

উত্তর ঃ মহান প্রভূর মহাবানী, "হে ঈমানদার বান্দারা যখন তোমরা কাফিরদের সাথে লড়াই কর তখন তোমরা দৃঢ়পগে সামনে এগিয়ে যাও। আর দৃঢ় কদম থাকার জন্য আল্লাহর স্মরণ অধিক

পরিমান করো।

যেহেতু মহান প্রভূর ফরমান এই; সেহেতু মুসলমানদেরকে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদে জমে থেকে লড়াই করে যাওয়া চাই। এবং আল্লাহর স্মরণ অধিক পরিমানে করা চাই। কেননা আল্লাহর স্মরণে বুকে সাহসের সঞ্চার হয় এবং অন্তর থেকে ভয়ভীতি মিটে যায়।

প্রশ্ন-৩১ ঃ জিহাদের ময়দান থেকে পশ্চাদগামী হওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ জিহাদের ময়দানে শত্রুকে পিঠ দেখিয়ে পিছিয়ে আসা মারাত্মক গোনাহের কাজ। পবিত্র কুরআনের বানী- "যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে পিঠ প্রদর্শন করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসে। হ্যাঁ, তবে যদি পিছনে পড়ে থাকা সমবেত আপন সৈন্য পর্যন্ত পৌঁছে শত্রুকে ধোকা খাইয়ে পুনরায় পশ্চাৎ দিক হতে দুর্দমনীয় আক্রমনের উদ্দেশ্যে পিছপা হয় তবে তার অনুমতি আছে এবং এটা কভু দোষের বা গোনাহের কাজও নয়।

প্রশ্ন-৩২ ঃ প্রিয় নবী সা. এর জীবদ্দশায় মোট কতজন সাহাবা রা. শাহাদাত বরণ করেন?

উত্তর ঃ প্রিয় নবী সা. এর জীবদ্দশায় মোট ২৫৯ জন সাহাবা রা. এই শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হয়েছেন।

প্রশ্ন-৩৩ ঃ প্রিয় নবী সা. এর জামানায় মোট কতজন কাফির মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে?

উত্তর ঃ হুযুরের সা. জামানাতে দুর্ভাগা ৭৫৯ জন কাফিরকে মুসলমানরা জাহান্নামে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩৪ ঃ রেবাত কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইসলামী সীমান্ত বা মুসলীম বাহিনীর সংরক্ষনের জন্য পাহারা দানকে "রেবাত" বলে।

প্রশ্ন-৩৫ ঃ রেবাতের গুরুত্ব কি?

উত্তর ঃ রেবাত অতি উৎকৃষ্টমানের আমল। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা একাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসুল সা. এর অসংখ্য ফজিলত বর্ণনা করেছেন। যে সৌভাগ্যবান মুজাহিদ রেবাতের আমল করবেন সে পূর্ববর্তী আমলের নেকী পেতে থাকবেন এবং ঐ চোখ যা পাহারাদানে জাগ্রত থাকে উহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা। এবং একদিনের পাহারাদারী গোটা ভূ-মণ্ডল ও তার মাঝে রক্ষিত সব জিনিস অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন-৩৬ ঃ প্রিয় নবী সা. এর এক নাম "নাবিয়ুস্ সায়ীফ" এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ "নবিয়ুস্ সায়ীফ" এর অর্থ অসি ধারক নবী।

প্রশ্ন-৩৭ ঃ হুযুর সা.কে 'অসি ধারক নবী' কেন বলা হয়?

উত্তর ঃ আমাদের প্রিয় নবী সা. নিজেই বলেছেন "আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে তরবারির সাথে প্রেরন করেছেন।" তারপর তিনি সা. যেহেতু তরবারির মাধ্যমে ঔদ্ধত্য কাফিরদেরকে দমন করেছেন যার ফলে মানুষেরা ইসলামের ছায়াতলে ঠাই নিতে সুযোগ পেয়েছিল এবং মানবতার আকাশে শান্তি নিরাপত্তা ও স্থিরতার তারকা উদিত হয়েছিল। সেহেতু নবী সা. এর আরেক নাম 'অসিধারক'। আর অসি বা তরবারির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিহাদ। সুতরাং 'নারিয়ুস্ সায়ীফ' এর অর্থ দাড়াল 'জিহাদী পয়গম্বর'। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রিয় নবী সা.কে জিহাদী শক্তি দান করেছেন, যাতে তাগুতী শক্তি তাঁর দাওয়াতের বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে না পারে।

প্রশ্ন-৩৮ ঃ রহমতে আলম নবী সা. বলেছেন আমি হলাম 'নাবিয়ুল মুলাহিম' এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ নাবিয়ুল মুলাহিম এর অর্থ যোদ্ধা নবী। এর ধাতু শব্দ 'মালাহিমাহ' চরম অবস্থার যুদ্ধকে বলে। যেহেতু হুযুর সা. এর যুগে যত জিহাদ সংগঠিত হয়েছে এর পূর্বে আর কখনো এতো যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। এবং এই জিহাদ উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে সেহেতু নবী সা.কে যোদ্ধা নবী বলা হয়ে থাকে। হুযুর সা. নিজে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে অবতীর্ন হয়ে দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁর যুগে তাঁর চেয়ে বড় বীর কেউ ছিলেন না (বলে ঐতিহাসিকগণের অভিমত এবং বাস্তব কথাও তাই)।

প্রশ্ন-৩৯ ঃ অন্যান্য দ্বীনী আমলের মোকাবেলায় জিহাদী আমলের মর্যাদা ও অবস্থান কি?

উত্তর ঃ জিহাদ সমস্ত দ্বীনী আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। কেননা জিহাদের মধ্যে জান ও মাল উভয়ের কুরবানী হয়ে থাকে। যা অন্য কোন আমলে নেই। তাইতো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও যেহেতু জিহাদ হলো অন্যান্য আমলের রক্ষক, সেহেতু এর শ্রেষ্ঠত্ব দান সহজেই বুঝে আসে।

প্রশ্ন-৪০ ঃ জিহাদী কাজে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা ব্যয়ের ফযিলত কি?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে আছে; জিহাদী কাজে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও তার মাঝে রক্ষিত সকল জিনিস অপেক্ষা উত্তম। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামাগণ লিখেছেন, যদি এক ব্যক্তিকে পৃথিবীর সব ধনসম্পদ ও সরঞ্জামাদি দিয়ে দেয়া হয় এবং সে সব কিছু আল্লাহ্‌র অনুসন্ধানে ব্যয় করে দেয়, তবুও তার বদলা ঐ ব্যক্তির সমপরিমানে হতে পারে না, যে জিহাদের কাজে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা ব্যয় করেছে।

প্রশ্ন-৪১ ঃ জিহাদ কখন ফরযে আইন হয়?

উত্তর ঃ যখন কুফরী শক্তি মুসলমানদের উপর আক্রমন চালিয়ে দেয় (চাই তা প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক) অথবা মুসলিম নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে নেয় অথবা মুসলমান ও কাফিরদের কাতার যখন রনাঙ্গনে মুখোমুখী হয়ে যায় অথবা মুসলিম খলিফা যখন লোকদেরকে জিহাদের প্রতি আহবান করে তখন এ সকল কারণে বা অবস্থাতে জিহাদ ফরযে আইন রূপে গৃহিত হয়।

প্রশ্ন-৪২ ঃ ফরযে আইনের অর্থ কি?

উত্তর ঃ ফরযে আইনের অর্থ জিহাদ সকল মুসলমানদের উপর ফরয হয়ে যাওয়া। কাহারো আদায় দ্বারা একাজ সবার তরফ থেকে আদায় হয়ে যায় না। যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় তখন পিতা-মাতার অনুমতি বা ঋৃনপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতির প্রয়োজন থাকেনা। এবং গোলামকে তার মুনীব হতে ও অনুচর বা চাকরীজীবিকে তার মালিক হতেও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়েনা।

প্রশ্ন-৪৩ ঃ জিহাদ না করায় কি অপরাধ?

উত্তর ঃ প্রিয় নবী সা. বলেছেন; যে ব্যক্তি জিহাদ করল না বা তার মনে জিহাদের কৌতুহল ও জাগলনা তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকাতের কোন এক প্রকার ভূক্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। এবং অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি জিহাদ করলো না এবং কোন মুজাহিদকে মাল-সামানা দিয়ে সহায়তাও করলো না এবং কোন মুজাহিদদের পরিজনের সেবাও করলো না। তবে আল্লাহ তাকে কিয়ামত পূর্বেই কোন না কোন কঠিন বিপদে নিপতিত করবেন।

প্রশ্ন-৪৪ ঃ যদি জিহাদের ময়দানে কোন মুসলমানের দেহ জখম হয়; তাহলে তার কি সওয়াব?

উত্তর ঃ জিহাদে জখমী হওয়ায় অনেক পূন্য রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে- কিয়ামতের ময়দানে যখন জিহাদের জখমী ব্যক্তি উপস্থিত হবে তখন তার রক্তের রং রক্তরাঙ্গা বা লাল থাকবে ঠিকই তবে তার সুগন্ধী হবে মিশ্‌কের ন্যায়।

প্রশ্ন-৪৫ ঃ যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনে যাত্রাপথে মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করে; তাহলে তার প্রতিদান কি?

উত্তর ঃ যে মুসলমান জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথিমধ্যেই মারা গেল, অথবা সে আরোহন থেকে পড়ে প্রাণ হারাল অথবা কোন বিষাক্ত জন্তুর দংশনে তাঁর প্রাণ নাশ হলো। এ সকল অবস্থাতেই তার জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।

প্রশ্ন-৪৬ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে সম্পদ ব্যয় করল তার কি সওয়াব?

উত্তর ঃ হুযুর সা. এর পবিত্র মুখের বানী, "যে ব্যক্তি মুজাহিদের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দিল, সে ব্যক্তিও জিহাদ করলো। যে ব্যক্তি আপন ঘরে বসে জিহাদের কাজে এক টাকা খরচ করে তাকে উহার সাতশত গুণ বেশীর প্রতিদান দেয়া হয়। আর যে নিজে ময়দানে গিয়ে খরচ করে তাকে একের পরিবর্তে সাতলাখের প্রতিদান দেয়া হয়। এবং আল্লাহ যাকে খুশী এর চেয়ে বেশীও দিয়ে থাকেন।"

প্রশ্ন-৪৭ ঃ সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি?

উত্তর ঃ সর্বোত্তম জিহাদ হল সেই জিহাদ; যার মাঝে মুজাহিদের ঘোড়ার পা কাটা যায় এমনকি তার আপণ লহুও প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ সে শহীদ হয়ে যায়। এটা পরিস্কার হাদীসের কথা।

প্রশ্ন-৪৮ ঃ শত্রুর প্রতি তীর নিক্ষেপে বা গুলি ছোড়ায় কি সওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি শত্রুর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলো (চাই তা শত্রুর গায়ে লাগুক বা না লাগুক) তীর নিক্ষেপকারী একটি গোলাম আযাদের সওয়াব পাবে। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিক্ষেপকৃত একটি তীরের বদলায় তিন ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। এক- যে সওয়াবের নিয়তে তীর বানিয়েছে। দুই- যে নিক্ষেপ করেছে। তিন- যে নিক্ষেপকারীর হাতে তীর তুলে দিয়েছে। (গুলির ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য)

প্রশ্ন-৪৯ ঃ জিহাদ কাফিরকে হত্যা করায় কি সওয়াব?

উত্তর ঃ প্রিয় নবী সা. বলেছেন, কাফির ও তার হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। অর্থাৎ কাফিরতো অবশ্যই জাহান্নামে যাবে পক্ষান্তরে তার হত্যাকারী যাবে জান্নাতে।

প্রশ্ন-৫০ ঃ জিহাদে বের হতে কি নিয়ত করা চাই।

উত্তর ঃ জিহাদে বের হওয়ার সময় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সন্তুষ্টিও তার দ্বীনে ইসলামের মান উন্নয়নের নিয়ত করা চাই। নিজেকে বীর বলানোর বা ধনসম্পদ জমা করার নিয়তে কভুই জিহাদে যাওয়া উচিত নয়॥

-সমাপ্ত-